KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন, (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৬/– ৬/– ৬/– ৬/–	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ আষাঢ়, ১৩৬৫ শ্রাবণ, ১৩৬৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 (0.50) SAMAKA

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ষষ্ঠ বর্ষ
জ্যৈষ্ঠ ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

দুরন্ত গতিকে

ব্যাহত করবেন না

ইস্পাত, সিমেণ্ট, কয়লা—
সমৃদ্ধতর ভারত গঠনে যা' কিছু
সহায়ক, তার সব কিছুই অধিকতর
পরিমাণে বহন করতে
গিয়ে সময়কেও হার মানাতে
চাইছি আমরা। এই মহৎ
প্রচেষ্টার অংশীদার হিসাবে
আপনার দানও যথেষ্ট। রেলের
চাকার দুরন্ত গতিকে কেউ যদি
ব্যাহত করতে চায়, আপনি
সহ্য করবেন কখনও?
আমাদের এই গুরু দায়িত্বের
সুষ্ঠু সম্পাদনে আপনার
সহযোগিতা উৎসারিত হোক।
আপনার সাহায্যপ্রার্থী আমরা।

পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ : ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ মুক্তি-সাধক সত্যেন বসু। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৫
রাষ্ট্রভাষা সমস্যা। সনৎকুমার রায় চৌধুরী ১০৯
বাংলার সারিগান। জয়দেব রায় ১২৪
অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ১১৮
উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯
ক বি তা ॥ শরভীতু। রাধারমণ প্রামাণিক ১৩৮
কী কথা সে বলে যাবে। গৌরীশঙ্কর দে ১৩৯
আ লো চ না ॥ সময় নেই। শঙ্কর গুপ্ত ১৪০
সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। সন্তোষকুমার অধিকারী ১৪৩
স মা জ স ম স্যা ॥ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসঙ্গে। সুব্রতেশ ঘোষ ১৪৫
স মা লো চ না ॥ বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী।
পুরাতনী। সোমেন বসু ১৪৭

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

ওঁরা দুজনে পাশাপাশি বাড়িতে থাকেন…
কিন্তু ওঁদের মধ্যে কি আকাশ পাতাল তফাৎ !

ওঁর চেহারা ওঁর প্রতিবেশীর মতই; ওঁরা জামাকাপড়ও পরেন প্রায় একইরকম। কিন্তু ওঁদের প্রত্যেকেই এক একজন আলাদা ব্যক্তি—কখনও দেখা যায় দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী, ভাব ধারার মধ্যে কি অসীম প্রভেদ। সত্যিই লোকজন এবং ওঁদের প্রতিবেশিদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ সম্বন্ধে জানারও আছে অনেক। হিন্দুস্থান লিভারে, মার্কেট রিসার্চ, অর্থাৎ বাজার যাচাই করার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায়, আমরা ওঁদের প্রয়োজন, আকাঙ্খা, পছন্দ অপছন্দ সব কিছু সম্বন্ধেই জানার চেষ্টা করি। ওঁরা আমাদের আপনার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য অনেক কিছুই জানান, আপনার প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে বুঝতে সাহায্য করেন, আপনার যে ধরনের জিনিস পছন্দ এবং যেগুলি আপনার রুচী, সামর্থ্য এবং জীবনযাত্রার উপযোগী সে ধরনের জিনিস তৈরী করতে আমাদের সাহায্য করেন। এই ভাবে আপনিই আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, আমাদের পথ দেখাচ্ছেন—কারণ আপনার জন্যেই আমরা জিনিসপত্র তৈরী করি, আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

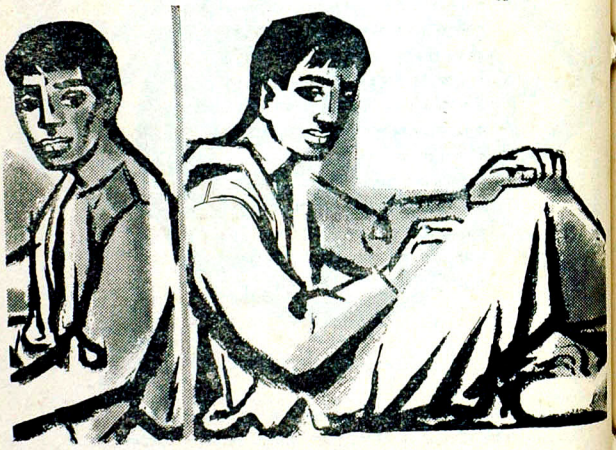

MLL. 10-X52 BG

মুক্তি-সাধক সত্যেন বসু

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পলাশীর যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এমন একটি পুরুষ জন্মালেন এই বাঙলা দেশে যিনি শুধু বাংলার জীবনে নয়, ভারতবর্ষের জীবনে নবজাগরণের, নব বসন্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। অন্য সব আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত তিনিই করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ভারতীয়দের জুরি নিযুক্ত করার দাবী, নুনের একচেটিয়া ব্যবসা রদ করবার আন্দোলন, হাটে হাটুরেদের কাছ থেকে তোলা নেওয়ার প্রথা বন্ধ করবার দাবী, বিলাসসামগ্রীর উপর ট্যাক্স্ বসাবার দাবী, জমিদার কর্তৃক চাষী-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ — এ সব তাঁর বিরাট কর্ম-ধারার সামান্য অংশ। তিনি চলে গেলেন। তখন সেই নবযুগের ধারাকে মুক্তধারা করে রাখবার জন্যে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে দেশহিতার্থী সভা, পরে ভারতবর্ষীয় সভা British Indian Association স্থাপন করে ভারতবাসীদের অবস্থার উন্নতিসাধন, চৌকিদারী ট্যাক্স্ যাতে গ্রামবাসীদের না দিতে হয় তার দাবী করণ, নুন তৈরী করার অপরাধে দণ্ডিত গ্রামবাসীদের যে কঠোর দণ্ড দেওয়া হোতো তার পরিবর্তন, স্বায়ত্তশাসন — এই সব দাবী জানালেন ভারতবর্ষীয় সভার সেক্রেটারী রূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম জানানো হোলো স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিদেশী শাসকদের কাছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের শাখা ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের দেশে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেলা প্রবর্তন করে দেশে-তৈরী জিনিসের ব্যবহার ও মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করার জন্যে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের তখনকার অবস্থায় এই ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে বিপ্লবপন্থী আন্দোলন বলা যেতে পারে।

এর অল্প দিন পরেই এলেন রাজনারায়ণ বসু। বলপ্রয়োগের দ্বারা বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবার মতবাদ প্রচারের জন্যে তিনি গুপ্তসমিতি স্থাপন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বালক রবীন্দ্রনাথ, এঁরা সবাই তখন রাজনারায়ণের চেলা। তারপরে সুরু

হোলো কংগ্রেসের যুগ। বছরের পর বছর আটপৌরে প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর কোনো কাজ তখন ছিলো না কংগ্রেসের। মহারানী ভিক্টোরিয়ার দৈহিক ও মানসিক অসুখের জন্যে ব্যাকুলতা, গভীর অস্বোয়স্তি বোধ, সমবেদনা ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা তখন কংগ্রেসের প্রস্তাব হিসেবে মহারানীর কাছে পাঠানো হোতো। আগের যুগের স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আন্দোলনও তখন অনুনয় বিনয় ও ভিক্ষার রাশিরাশি প্রস্তাবের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাগিচায় তখন দরখাস্ত-রাজনীতিজ্ঞদের মৌসুম। সেদিন শুধু বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী সাধকদের দুঃসাধ্য সাধনা চল্‌ছে লোক-চক্ষুর অন্তরালে। এতো কাপুরুষতা, এতো জমাট ভয় জাতির প্রাণকে চেপে ধরে ছিলো, আত্ম-অবিশ্বাস সে দিন কর্মশক্তিকে এমন করে টুঁটি চেপে পঙ্গু করে রেখেছিলো যে সাহস সঞ্চার করা, আত্ম-বিশ্বাস ও পৌরুষ ফিরিয়ে আনাই ছিলো সে দিন ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার সব চেয়ে বড়ো কাজ। এই বৈপ্লবিক ব্রত সাধন করবার জন্যে এগিয়ে এলেন একদল তরুণ। বিদেশী শাসকদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে হবে ও সেই বলপ্রয়োগ নৈতিক, যিনি এই ধারণার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম বলপ্রয়োগ সমর্থক বিপ্লবী রাজনারায়ণ বসুর পরিবার থেকেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রষ্টারা এলেন—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন বসু। প্রথম দু জন হলেন রাজনারায়ণের দৌহিত্র ও শেষ দু জন হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন বসু হোলেন রাজনারায়ণ বসুর ছোটো ভাই অভয়চরণ বসুর পুত্র। ১২৮৯ সালের ১৫ই শ্রাবণ (ইংরিজী মতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই) মেদিনীপুর সহরে সত্যেন বসুর জন্ম। পনেরো বছর বয়েসে জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রেন্স পাশ করেন ও মেদিনীপুর কলেজ থেকে এফ্-এ পাশ করে কলকাতায় সিটি কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, থাইসিস্ হয়েছে সন্দেহ হয়। তাই কলেজে পড়া ইস্তফা দিয়ে শরীর সারাতে ওয়াল্‌টেয়ারে চলে যান। রাজনারায়ণ, অরবিন্দ ও ওঁর দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ, এঁরা তিনজনই ছিলেন সত্যেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস।

কিছু দিন পরেই ব্রিটিশ শাসনকে বলপ্রোয়োগের দ্বারা উচ্ছেদ করবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু আসেন প্রেসিডেন্সী জেলে। বন্দী অবস্থাতেই রাজ-সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে নিহত করলেন তাঁরা প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতরে। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেলো।

তারপরে প্রাণ-নিবেদনের রক্তরাঙা পথ ধরে বহু মুক্তিকামী সাধকেরা এলেন। জাতি আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেলো সাহস ও আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। তার পরের ইতিহাস হচ্ছে যে আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে জাতিকে যেতে হয়েছে মুক্তির সন্ধানে, তার ইতিহাস। সে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে স্বাধীনতা-লাভের সংগে সংগে। ইতিমধ্যে দেশ ভুলেও গেছে সেই সাধকদের যাঁরা সমস্ত জীবন দিয়ে জাতির প্রাণের অন্ধকার দূর করে দিয়ে সেখানে আলো জেলেছিলেন। এমনিই হয়ে থাকে। কাল বড়ো নির্মম, অতীতকে ভুলিয়ে দেওয়ার লীলাতেই কালের হৃদয়হীন কৌতুকপ্রিয়তার প্রকাশ। বর্তমান হচ্ছে এই ব্যথাহীন কালের সন্তান। তাই বেদনা পেলেও এই বিস্মরণকে কালের দান হিসাবে স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু মানুষ যখন ইতিহাসকে বিকৃত করে নিজের মনের বিকার দিয়ে তখন সেই ইতর বিকৃতি মনকে পীড়া দেয়। তখন বীরের বীরত্ব, ত্যাগীর ত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে সেই মিথ্যার প্রতিবাদ করা

দরকার হয়ে পড়ে।

সত্যেন বসু সম্বন্ধে অনেক কাল থেকে একটি প্রচার চলে আস্‌ছে যে তিনি ফাঁসির কিছু দিন আগে থেকে বড়ো কাতর ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কে যে একথা রটনা করেছিলো, কি উদ্দেশ্য নিয়ে রটনা করেছিলো তা জানি না। বিপ্লবপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রেষারেষি থাকায়। উপদলীয় শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করবার জন্যে এ ধরণের ইতর প্রচার কোনো সময়েই দুর্লভ ছিলো না। পরবর্তী যুগে বিরুদ্ধ দলের লোকদের সম্বন্ধে এই ধরণের প্রচার দলগুলির রাজনৈতিক কর্মের অন্যতম কাজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই প্রথম যুগে? তখনও কি এই ধরণের নীচতার বেসাতি ছিলো?

কয়েক মাস আগে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলুম। অনেক কাল থেকে শুনে আসছিলুম যে রাজনারায়ণ বসুর এক ভাইয়ের দুই মেয়ে মেদিনীপুরে বাস করেন। এবারে তাঁদের মধ্যে একজনের সংগে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দুই বোনের একজনের বয়েস আশি পেরিয়েছে, আর এক জনের বয়েস আশির উপকূলে। সেদিন বিকেলে তাঁদের বাড়িতে বসে আলাপ করবার সময়ে জানলুম যে এঁরা হচ্ছেন সত্যেন বসুর নিজের দুই দিদি। ঘরের দেয়াল থেকে একটি ফ্রেমে-বাঁধানো আবছা হয়ে যাওয়া একটি চিঠি নামিয়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বৃদ্ধা বল্লেন—"এটি সত্যেনের শেষ চিঠি ফাঁসির তিন দিন আগে লেখা। দেখুন পড়ে, একটুও কাতর হয় নি সে।" মৃত্যুর হাত

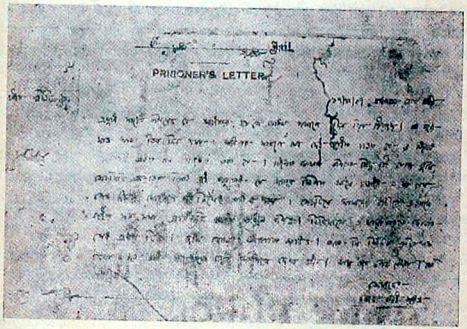

থেকে বরমাল্য নেবার জন্যে প্রতীক্ষা-রত সাধকের শেষ চিঠিখানি পড়লুম। চিঠির তারিখ ১৭ই নভেম্বর, ১৯০৭ সাল। প্রেসিডেন্সী জেলের ফাঁসি-কুঠরি থেকে চিঠিটি লেখা। পঞ্চাশ বৎসর বয়ে গেছে চিঠিটির উপর দিয়ে। এতো কাল চিঠিটি গৃহ-কোণে পড়েছিলো। আত্মীয়-দের ভালোবাসাই এতোদিন একে রক্ষা করেছে। লেখা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কাগজটি জরাগ্রস্থ। পড়লুম চিঠিটি। এতোটুকু উদ্বেগ বা ভয়ের চিহ্ন নেই চিঠিটিতে। পঞ্চাশ বৎসরের উজান

ঠেলে মন চলে গেলো ১৯০৭ সালে। দেখলুম মানসচক্ষে, বসে আছেন দেশের মুক্তি-সাধক তরুণ বীর আধো-আলো-আধো অন্ধকার ছোট্ট ফাঁসি-কুঠারিতে। ভয়হীন মন আনন্দোচ্ছল প্রশান্তিতে ভরা, বসে আছেন তিনি মৃত্যুর হাত থেকে দেশপ্রেমের বরমাল্য নেবার প্রতীক্ষায়। বল্‌লুম মনে মনে — হায় রে, তোমাকে ভীরু বলে জাহির করবার লোকও এ দেশে জুট্‌লো! তা না হোলে এতো দুর্দশাই বা হবে কেন বাঙলার ও বাঙালীর!

সেই দিনই বিকেলে সত্যেন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলুম। বীরেন বাবুর দিদি সত্যেন বসুর লেখা আর একটি চিঠি আমাকে দেখালেন।

পূজনীয় দাদাবাবু।

গত শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন—কিন্তু আসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্য আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আজ পর্যন্ত আসিলেন না। যাই হউক—আজ এখনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিলেন যে আপিল অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ২১শে তারিখ, শনিবার—সকালে দিন স্থির হইয়াছে। অতএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়। পত্র-পাঠ আপনি অবশ্য একবার শেষ দেখা করিয়া যাইবেন। যেদিন আসিবেন সেদিনই দেখা হইবে। অন্য কেহ যদি দেখা করিতে চান সঙ্গে লইয়া আসিবেন—মিঃ রায়কে দেখিতে ইচ্ছা করে যদি তিনি আসেন তবে সুখী হইব। তৎপরে দাদা! আপনার নিকট একটী অনুরোধ আছে—জানিবেন, আপনার নিকট এটী আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ—সেটী এই যে আপনি যে রকমই ভাবুন আমার অনুরোধ ভাবিয়া দেখিবেন যেন শেষ জীবনে এই বৃদ্ধ বয়সে মা কোন বিশেষ কষ্ট না পান। আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে আসিয়া দেহ লইয়া যাইবেন। নলিদি প্রভৃতি আসেন ভালই। প্রার্থনাদি করিয়া যেন সৎকার করা হয়। আশা করি পত্র-পাঠ একবার দেখা করিয়া যাইবেন। ইতি

আপনার
স্নেহের ভাই সত্যেন

একই দিনে দুটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন, একটি দিদিকে, অন্যটি দাদাকে। এই চিঠিদুটি থেকে সত্যেন বসুর মনের যে ছবি আমরা পাই তা যেমন বীরত্বপূর্ণ তেমনি কোমল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রকৃত কোমলতা সেতো বীরত্বের নিত্য উপাদান, চির সহচরী। আর কোমলতার যথার্থ প্রকাশ সেতো শুধু বীরত্বেই।

রাষ্ট্র-ভাষা সমস্যা

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

সম্প্রতি ভাষার উপর যে বিতর্কজাল সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যূহ ভেদ ক'রে আজ সোজাপথের নিশানা পাওয়া দুষ্কর সাধনা। জাতির জীবনে এই ধরনের মৌলিক ও মূল প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগের ঘন কুয়াসাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এর পিছনে থাকে না বৈজ্ঞানিক অনুবিশ্লেষণ বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সূক্ষ্মবিচার। মূল সমস্যাকে এড়িয়ে আমরা বরাবর শুধু সাময়িক ব্যবহারিক সমাধানের পথ খুঁজে মরি, এর ফলে সুবিধাবাদের গোলকধাঁধাতে ঘুরতে হয়, সত্যিকার সমস্যার কোন সমাধান হয় না। তারপর রাজনৈতিক রাঙা চোখ দিয়ে যখন এই সব মূল সমস্যার সমাধান করতে যাই তখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তার সমাধান হয়ে যায় রাষ্ট্রশক্তির তর্জনী ইঙ্গিতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে অথবা আইনের কলাকৌশলে। জাতির ভাষাও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে মূল প্রশ্নগুলির সমাধানের পথে যে অসীম ধৈর্য, যুক্তিনিষ্ঠা ও মননশীলতা প্রয়োজন সেই বিষয়ে অনেকের চোখ এড়িয়ে যায়। ভাষা ও ভাব আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ, কোমল ও পেলব বস্তু, তাকে আরও দশটা বস্তুর মতো যান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তন করবার দুশ্চেষ্টা শুধু মাত্র বালসুলভ বা হীনমস্তিষ্কের পরিচয় দেবে।

ভারত সরকার যে ভাষাকমিশন নিযুক্ত ক'রেছিলেন তার প্রধান সিদ্ধান্ত হোল যে হিন্দী ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা হিসাবে গণ্য হবে। আমাদের এই বহুভাষী দেশে এক বিশেষ ভাষাকে বাছাই ক'রে সরকারী তক্‌মা এঁটে দিয়ে সারাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া যত সোজা তাকে কার্যকরী ক'রে তোলা তত সহজ মনে হয় না। সরকার মহলে এই অকারণ ও অশোভন ব্যস্ততা শুধুমাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। আজ কোন্ বিশেষ ভাষাকে সর্বভারতীয় জাতীয়ভাষা বলে গ্রহণ বা বর্জন কোরব? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের চিত্ত সহজে ও সানন্দে তার নির্ধারিত ভাষার সপক্ষে সায় বা অপরভাষার বিরুদ্ধে রায় দেবে। এই সম্মতি আসবে অন্তরের তাগিদ থেকে বাইরের চোখরাঙানিতে নয়। ভাষা ফুলের মতো আপনি ওঠে, বাইরের চাপে অথবা কাটা বেড়ার শাসনে তার সহজ গতি হারিয়ে ফেলে। নিয়মের বাঁধনে তাকে চারিদিক থেকে না বেঁধে তার ভিতরকার রসবোধকে অবাধমুক্তি ও স্বচ্ছন্দগতিকে সুগম করা হউক আমাদের কাম্য। ভাষা হচ্ছে সত্তার একান্ত ও পরম অভিব্যক্তি। ভাষার ধ্বনিতরঙ্গের সাথে লীলায়িত হ'য়ে ওঠে আমাদের মনপ্রাণ। যে ভাষার সাথে আমাদের নিবিড় আত্মিক যোগ রয়েছে অথবা যার মাধ্যমে আমাদের আত্মপ্রকাশের বা বিকাশের সমস্ত পথ উন্মুক্ত ও অবারিত সেই ভাষাকে আমরা সহজে হৃদয়ের সাথে গ্রহণ করি। ভাষার বীজ বপন হয় মনের সরস জমিতে। আত্মপ্রকাশের আনন্দে, রসসিক্ত মনের দাক্ষিণ্যে ভাষার অঙ্কুর পল্লবিত হয়ে ওঠে। নানা শাখাপ্রশাখাতে সঞ্চারিত হয় ভাষার বিচিত্র ছন্দ ও মূর্চ্ছনা। অন্তরের গভীরতম ভাব উৎস থেকে ভেসে আসে ভাষার ধ্বনিপ্রবাহ। যে ভাষার ভিতর দিয়ে নিজেকে সহজে ব্যক্ত কোরব তার উৎস হোল আমাদের হৃদয়, আমাদের মনের গহনতল। মনের ভাষাকে মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে যদি বাইরের সরকারী যান্ত্রিক ভাষা মুখে জুড়ে দিই সে ভাষা হবে না তা হবে সরকারী সানাই। সরকারী ভাষা ও জাতীয় ভাষা কি একই পর্যায়ে পড়বে? সরকারী ভাষা হবে প্রয়োজনসিদ্ধির যন্ত্র (tool language) সেই ভাষার মারফৎ

বাজারের লেন-দেন চ'লবে কিন্তু তার সাথে থাকবে না মনের নিবিড় স্পর্শ, নাড়ীর যোগ, তার মারফৎ চলবে না ভাবের সহজ বিনিময়। মাতৃভাষার সাথে যোগ রয়েছে ভৌগলিক আবহাওয়ার, মাটির টান, তার ধমনীতে বয়ে চলেছে নদীর তরঙ্গধ্বনি, তার চারিপাশে ছড়ানো রয়েছে সুরভিত বাতাসের স্নিগ্ধপরশ। আজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলতি আঞ্চলিক ভাষাকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত ক'রে উপর থেকে সরকারী ফরমান দিয়ে একটি সর্বভারতীয় ভাষা সারাদেশের উপর চাপাবার চেষ্টা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উপর নির্মম আঘাত করবে। আমাদের মন বাইরের চাপে স্বভাবতঃ বেঁকে বসে। একদিন জাতির অন্তরাত্মা থেকে এই সাবধান বাণী ঘোষিত হ'য়েছিল কবির বজ্রকন্ঠে। ভয়ের অপদেবতাকে লড়বার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন দেশের লোককে আহ্বান করেছিলেন। তিনি ব'লেছেন—

"দেখছি দেশের মনের উপর বিষম চাপ।...কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে—বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে। অন্ধবিশ্বাসের কাছে। কেন বাধ্যতা? আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ।...চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্য আমাদের লড়তে হবে।" মুক্তির এই উদাত্ত আহ্বান আমাদের দেশের আকাশে বাতাসে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। ভাবজগতের এই সব অতন্দ্রপ্রহরীদল অন্ধবিশ্বাস বা কর্তৃপক্ষের হুকুমজারীর কাছে মাথা অবনত ক'রে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে চোখ বুজে চলবার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম ক'রেছেন। সত্যকে অন্ধবিশ্বাসের কাছে বলি দেন নি। আজ তাঁদের নির্ভয়বাণী ও তীক্ষ্নদৃষ্টি আমাদের মনের বাতায়নকে উন্মুক্ত ও দৃষ্টিকে করুক সুদূরপ্রসারিত।

বর্তমান ভারতে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বিশেষ একটা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেবার পূর্বে আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সেই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের বিভিন্ন প্রদেশ প্রায় হাজার বছর ধরে তার গোষ্ঠী জীবনকে স্বকীয় ভাষার মাধ্যমে নানাভাবে, নানা রসে রূপায়িত করে চলেছে। বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী জীবনের গভীর ভাবাবেগ, ঘাতপ্রতিঘাত, হাসি কান্না বিচিত্র রাগে ও সুরে ছন্দিত হয়েছে। একইভাবে গুজরাটী বা মারাঠি অধিবাসীরা নিজেদের ভাষার ভিতর দিয়ে, পাঞ্জাব তার গুরুমুখী ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ ক'রছে; মান্দ্রাজ প্রদেশের গোষ্ঠীজীবন প্রবাহিত তামিলভাষার নিত্যস্রোতে। এই বিচিত্র ভাষা ও সুর ভারতীয় জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিবিড় বন্ধন ও ঐক্যকে কোনদিন শিথিল বা ব্যহত করেনি। এই বিচিত্রতার ভিতর ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা তার মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও ঐকতান সৃষ্টি করে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত অগণিত লোকের প্রাণ ও মন একসূত্রে বেঁধেছে। বিচিত্রতার ভিতর ঐক্যসাধনা ভারতের সাধনার মর্মকথা।

ঐক্যসাধনার মূল সূত্র হোল যে বিশেষকে অবলুপ্ত বা অস্বীকার করে নয়। বিশেষকে যথাযোগ্য স্থান দিয়ে সমষ্টির ঐকতানে তার সুর বেঁধে তোলা। অবয়বহীন পিন্ডাকৃতি ঐক্যের উদ্দেশ্যে বিশেষের স্বকীয়তাকে উৎসর্গ করার অর্থ জাতীয় সংহতির নামে প্রহসন সৃষ্টি করা। আজ জাতীয় ঐক্যের ও নামান্তরালে হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রীয়করণ করে সারাদেশের উপর চাপিয়ে দেবার যে প্রচেষ্টা চলছে তার পিছন রয়েছে অদূরদর্শী কর্তৃপক্ষের অন্ধমত্ততা। শিল্প ও ভাষাকে একই পর্যায়ে ধরে জাতীয়করণ করা যান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দেবে। আমাদের এই বিশাল দেশে ভাষাবৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী হিন্দীকে একক

জাতীয় ভাষা বলে ঘোষণা করা শুধু মাত্র ক্ষমতাসীন শক্তির মদোন্মত্ততা প্রমাণ দেবে।

ভারতের সভ্যতাধারা ঐতিহাসিক নানা ঘাতপ্রতিঘাত, বৈচিত্র্যময় পরিবেশের ভিতর প্রবাহিত হলেও সেই স্রোত সাংস্কৃতিক জীবনে সমন্বয়ের সাধনা করেছে উজ্জ্বল ও অন্তর্নিহিত ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে করেছে প্রতিষ্ঠিত। এই মিলনের যোগসূত্রও সমন্বয়ের বাণী এসেছে অন্তরের গভীরতা থেকে ভাষার প্রবাহ থেকে উচ্ছ্বসিত নয়। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য কোনদিনই একভাষাভিত্তিক ছিলনা, এর মূলে ছিল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ঐক্যবোধ। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে একভাষিকতা একজাতীয়তার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্বীকৃত নয়। ইংরেজ ও এমেরিকার ভাষা এক কিন্তু তারা পৃথক জাতি। সুইস্ ও যুগোশ্লাভরা একজাতি কিন্তু ভাষা তিনটি। সোভিয়েট রাশিয়া সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি বহু ভাষিক দেশে রাজনৈতিক ঐক্য ও জাতীয়তার বন্ধন একবিন্দু শিথিল হয়নি এবং পুরোমাত্রায় অক্ষুণ্ণ র'য়েছে।

জাতীয় ঐক্যের সোপান গড়ে ওঠে দেশের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ মমতাবোধ এক সংস্কৃতির ধারায় পরিবর্ধিত সমঅনুভূতি। এক জাতি, এক মন, এক প্রাণ জাতীয় ঐক্যের বন্ধন বহুলাংশে নির্ভর করে ভাষার উপর—এই কথা আমাদের স্বীকার ক'রতে বাধা নেই। তবে এর সাথে এই কথাও স্বীকার্য যে ইউরোপে বহুভাষাভাষী রাশিয়া বা সুইজারল্যান্ড, বিশেষ করে ভারতবর্ষে যেখানে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ভাবের সমন্বয়সাধন হয়েছে সেখানে শুধু মাত্র ভাষাকে ভিত্তি করে জাতীয় চেতনা পুষ্টিলাভ করে নি। বিচিত্র ভাষাতরঙ্গিনী, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা, নানাবিধ সংস্কার সবার ভিতর যে মিলনের সুর ছিল সেই অন্তর্নিহিত ঐক্য ভারতীয় জীবনকে এক অখন্ড সূত্রে বেঁধেছে। এক দেশ, এক আবাসভূমি, এক ইতিহাসের ধারা আমাদের সমষ্টি জীবনকে দিয়েছে আধ্যাত্মিক ঐক্য ও জাতীয়তার আদর্শে করেছে অনুপ্রাণিত। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য কোনদিনই একভাষাভিত্তিক ছিলনা, এর মূলে ছিল একটি অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ ধারা। কিন্তু আজ জাতির ঐক্যের পতাকা সম্মুখে রেখে হিন্দীভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা বলে সরকারী দপ্তর থেকে যে প্রচার সুরু হয়েছে তার উগ্রপ্রতিক্রিয়া জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ় করার থেকে বরং তীব্র আঘাত করছে। সরকারী ভাষা কমিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ পি সুব্বারায়ন এই প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন "আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ ভাষাকে অন্যসব ভাষার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে.........হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ অঙ্কুরিত হচ্ছে এই আশঙ্কা অনেকেই করছেন। এইভাবে হিন্দীর প্রচলন জাতীয়তাবিরোধী হবে কেন না সংখ্যার আধিক্যদাবী করা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যভাষাগুলির চেয়ে কোনো প্রাধান্য হিন্দী ভাষা দাবী করতে পারে না। ...... কতকগুলি হিন্দীভাষা এলাকাতে উগ্রপ্রাদেশিকতা সম্প্রতি মাথা তুলছে।"

রাষ্ট্রের প্রাসাদে হিন্দীভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষাকে নিষ্প্রভ করে আপন প্রাধান্য বিস্তার করবে তার আভাস ইতিপূর্বে পেয়েছি। ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদ সোজাসুজি স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কাছে লিখেছেন — "এখন ভাষা কমিশন নিযুক্ত হয়ে যাওয়ার পর এ কথা সুনিশ্চিত যে তাঁরা হিন্দী প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করবেন। এর সাথে এমন কি তারা ক্রমান্বিতভাবে হিন্দীপ্রবর্তনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় ও নির্দেশ করতে পারেন। তা ছাড়া যাঁরা ইতিমধ্যেই চাকরীতে নিযুক্ত আছেন তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকে যাতে হিন্দীতে পারদর্শিতা লাভ করে তার ব্যবস্থা যদি সম্পন্ন না হয় তা হলে আমরা কেন্দ্রীয় সেরেস্তায় হিন্দী প্রবর্তনে সক্ষম হব না।" এই থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারও কতগুলি

হিন্দীভাষী রাজ্য বর্তমানে হিন্দীকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ভাষা কমিশন যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন তার থেকে দু একটা উল্লেখ করলে আমাদের বক্তব্য সুপরিষ্কার হবে। প্রথমতঃ এদের সুপারিশ অনুযায়ী ভবিষ্যতে শিক্ষা বিষয়ে এবং রাজনৈতিক ও শাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারে হিন্দী ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা বলে গণ্য হবে।

২। ভারতবর্ষের লোকসভায় শুধু হিন্দীভাষা ব্যবহার করা হবে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারেরও রাজ্যসরকারগুলির সব কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক ভাবে হিন্দী শিক্ষা করতে হবে। হিন্দীভাষা না শিখলে তারা দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে।

৪। সুপ্রীম কোর্টে হিন্দী একমাত্র ভাষা বলে গ্রাহ্য হবে ও হাইকোর্টের সব রায় হিন্দীভাষায় লিখিত হবে। সারা ভারতের অধস্তন কোর্ট গুলিতে হিন্দীভাষা প্রাদেশিক ভাষাগুলির সহিত ব্যবহৃত হবে।

ভাষাকমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিন্দী শিক্ষার সর্বস্তরে অবশ্যপাঠ্য বলে নির্দ্ধারিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কাজ, সুপ্রীম কোর্টে আইনের সওয়াল, ১৯৬৫ সালের পর সর্ব ভারতীয় পরীক্ষার সবকিছু হিন্দির মাধ্যমে হবে। এই কমিশনের মত অনুসারে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ও শাসন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সর্বত্র বিশেষ সুবিধাভোগী একটি হিন্দী ভাষাভাষী শ্রেণী প্রভুত্ব করবে এবং তার বিষক্রিয়ার ফলে অহিন্দী ভাষীদের ভাষাগুলি তাদের নিজেদের প্রদেশে ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রমশঃ নিষ্প্রভ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই আশঙ্কা অমূলক নয়। এক-দিন এই আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠনের দাবী নিয়ে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল। এই ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের ফলে মাদ্রাজ প্রদেশ ভেঙ্গে অন্ধ্র দেশ গঠিত হোল; মধ্যপ্রদেশকে ভেঙ্গে বোম্বাই ও নূতন মধ্যপ্রদেশ মারাঠি ও হিন্দীভাষী অঞ্চল সমূহকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে; মালয়ালাম ও তামিলভাষী অঞ্চলের সীমানার পুনর্বিন্যাস ও হায়দরাবাদকে ভেঙ্গে দেওয়া হোল। হায়দরাবাদ রাজ্যের জনসংখ্যার নয়দশমাংশ তেলেগু, মারাঠা, কানাড়ী ভাষাতে কথা বলে। পূর্বে হায়দরাবাদের নিজাম একদশমাংশের ভাষা উর্দ্দুকে সরকারী ভাষা বলে সবার উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। আজ হিন্দীভাষাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ-দের ভাষা বলে চালাবার জন্য হিন্দীভাষীর সংখ্যাকে নানা কৌশলে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। হিন্দীর সমগোত্রীয় ভাষা যেমন রাজস্থানীয় ভাষাকেও হিন্দী বলে ধরা হয়েছে। অহিন্দী অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া সম্ভবতঃ বিক্ষোভ ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা সৃষ্টি করবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীগণ মনে করেন হিন্দীকে সরকারীভাষারূপে গ্রহণ করা আত্মঘাতী নীতিরই সামিল হবে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন ভারতীয় ইউনিয়নের সর-কারী ভাষারূপে ইংরেজী ভাষাকেই চালু রাখা এবং সেই অনুসারে ভারতের সংবিধানের সংশো-ধনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তারা বিশ্বাস করেন যে হিন্দীভাষার মারফৎ উত্তর ভারত দক্ষিণ তথা সারাভারতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে। তাদের এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। এই সম্মেলনের নেতা শ্রীচক্রবর্তী রাজা-গোপাল আচারী বলেন যে হিন্দীভাষা এখনও ভারতের সরকারী ভাষারূপে ইংরেজী ভাষার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। এই অবস্থাতে হিন্দীভাষাকে আইনের জোরে সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তনের ফলে ঐক্যসাধনের পরিবর্তে অনৈক্যেরই সৃষ্টি করবে। হিন্দী-ভাষার প্রতি রাষ্ট্রের কৃপাকটাক্ষ পড়ার দরুণ হিন্দীভাষাভাষী অধিবাসীগণ ক্রমশঃ রাষ্ট্রে ও সমাজে যে ক্রমশঃ সুয়োরাণীর মর্য্যাদা লাভ করবে, অপরপক্ষে অহিন্দীভাষাভাষী দুয়োরানীর পর্য্যায়ে নেমে আসবে বর্তমান ইতিহাস তারই ইঙ্গিত দেয়।

স্যার মির্জা ইসমাইল এই প্রসঙ্গে বলেছেন — "অনেকে মনে করেন যে ভারতের জনগণের শতকরা মাত্র একজন ইংরেজী জানেন অন্যদিকে ভারতের শতকরা ৪২ জন লোক হিন্দী ভাষাতে[১] কথাবার্তা চালাতে পারেন তাহলে হিন্দীভাষাকে জাতীয়ভাষা বলে সম্মান দেখানো নীতিসঙ্গত। কিন্তু এর সাথে তারা একটি বিশেষ তথ্যকে দেখতে ভুলে যান যে ভারতবর্ষে হিন্দী একটি জায়-গায় সীমাবদ্ধ কিন্তু ইংরেজীভাষা ভারতবর্ষের শিক্ষিত মহলে সর্বপ্রচারিত। ভারতবর্ষে পাঁচ ভাগের দুভাগ লোক হিন্দীভাষা বলেন, এই দুভাগ লোক মধ্যভারত ও যুক্তপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত। অন্যপ্রদেশে বাকি তিনভাগ লোকের ভিতর হিন্দী ভাষার প্রচলন তেমন নেই। হিন্দীভাষার এখনও কৈশোরকাল চলছে। বাংলা, তামিল তেলেগু, মারাঠি বা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার তুলনায় হিন্দীভাষা এখনও অনুন্নত ও বহুমুখী নয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন অথবা উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দীভাষার অপরিসীম দৈন্য চোখে পড়লে বর্তমান অবস্থায় এই ভাষাকে জাতীয় ভাষার সিংহাসনে বসানো অদূরদর্শিতার পরিচয় দেবে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে একশ বছর পূর্বে আধুনিক নমুনার হিন্দীগদ্য যথা খড়ীবোলীতে লিখিত কোন কাব্য রচিত হয়নি। কবীর মীরা—বাঈ ও তুলসীদাসের গীতিকবিতাই ছিল হিন্দী সাহিত্যের একমাত্র কাব্যসম্পদ।

আমরা কি জানতে পারি বর্তমান অবস্থায় হিন্দীভাষার শব্দসম্ভার, ঝঙ্কার ও অলঙ্কার বিশেষভাবকে রূপায়িত করবার জন্য শব্দ যোজনা কি এত সুনিপুণ ও নিখুঁত হয়েছে যে আই-নের সূক্ষ্ম জেরা চিকিৎসার ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নানাবিধ গবেষণা, দর্শন ও কাব্যের গভীর ভাব এই পর্য্যায়ে উঠতে পারেনি যেখানে বাজারের লেনদেন বা পথে ঘাটে দুচারটা সংলাপ অনুভূতি এই ভাষার মাধ্যমে নিজেকে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে? হিন্দীভাষা আজও ছাঁয়াতলে পরিপুষ্ট হয়ে যেদিন বাংলা, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি অন্যান্য উন্নত আঞ্চলিক ভাষার উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে সেদিন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে মহাদুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। বাংলা, মারাঠি অথবা ওড়িয়া ভাষার ঐতিহ্য হিন্দীর তুলনায় বহু প্রাচীন। ভারত-বর্ষের চলতি ভাষাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর ভারত পড়ে আর্য্য ভাষা গোষ্ঠীতে, আর দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীতে ধরা হয়। এই ভাষাগুলির ইতিহাস সুপ্রাচীন।

এই প্রসঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার ভিতর বাংলাভাষার কথা ধরা যাক্। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষের নবজাগরণ বা রেঁনেসার প্রথম আলোরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার শরত আকাশে। জাতীয়তার উন্মাদনা সৃষ্টি কোরল বাংলার বিদ্রোহী কবিদল। সেদিন বাংলার শ্যাম-প্রান্তর থেকে ঘোষিত হয়েছে জাতীয়তার অগ্নিগর্ভবানী। বহু সাধনায় অনুরঞ্জিত হয়ে বাংলা-ভাষা স্বাধীনতার অমোঘমন্ত্র, সঙ্গীত ও প্রেরণা দিয়ে দেশকে প্লাবিত করেছে। তারপর সূর্যকরে উদ্ভাসিত হোল বাংলার কাব্যগগন রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর আবির্ভাবে। ভাবজগতের বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত হোল ভাষার বিচিত্র তরঙ্গে। একটি ভাষার রূপান্তর হোল বিরাট প্রতি-ভার পরশমণি স্পর্শে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বহু সাহিত্যরথীর সারাজীবন সাধনায় মহিমান্বিত হয়ে বাংলাভাষা বিশ্বের যে কোন ভাষার সমকক্ষ হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘ-দিনের মনন সাধনা যুগান্তরকারী প্রতিভার উজ্জ্বল অবদান। বাংলাভাষা ছাড়া দক্ষিণ ভারত ও মহারাষ্ট্রের আঞ্চলিক ভাষা দীর্ঘকাল স্থানীয় প্রতিভার সংস্পর্শে এসে যত তীব্রগতিতে এগিয়ে

১ ভাষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এই শতকরা ৪২ জন হিন্দীভাষাভাষীর ভিতর হিন্দীর সাথে হিন্দুস্থানী, উর্দু ও পাঞ্জাবী ধরা হয়েছে।

চলেছে হিন্দীভাষা এই তুলনায় আজও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আজ এই অর্ধউন্নত ভাষাকে একক জাতীয়ভাষা বলে সম্মান প্রদর্শনের পিছনে রয়েছে অন্ধ জাতীয়তা ও ভাবাবেগের প্লাবন। মনে হয় ভাষাকমিশন গোড়া থেকে যুক্তিনিষ্ঠার উপর নির্ভর না করে হিন্দী ভাষাকে জাতীয়-ভাষা বলে ঘোষণা করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

একদা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশজোড়া যে মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই জাতীয়তা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন গান্ধীজী। সেদিন জাতীয়তার প্লাবনে বিদেশী শাসন, বিদেশী দ্রব্য তার সাথে বিদেশীভাষাও প্রায় সমপর্যায়ে এসে পড়েছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষবহ্নি দেশের অন্তরে জ্বলছিল সেই উত্তপ্ত হৃদয় সেদিন ইংরেজদের শাসন ও তাদের রচিত ভাষার ভিতর প্রভেদ না করে দুইএর মাঝে একই প্রতিধ্বনি শুনেছিল। ইংরেজ বণিক্‌দের শাসন আর ইংরেজীভাষা দুটো একজাতের নয় অন্ধজাতীয়তাবাদীর চোখে সেদিন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি।

সেদিন গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দীভাষা জাতীয়তার স্রোতে নাগরী প্রচারিনীর মারফৎ সারা-ভারতে বিপুল উৎসাহে প্রচারিত হতে শুরু হোল। হিন্দীভাষা হোল দেশপ্রেমের রক্ষাকবচ। হিন্দীভাষার বিরুদ্ধে দল সেদিন জাতীয়তাবিরোধী দল বলে পরিচিত হোল। আজও নব-লব্ধ স্বাধীনতার অত্যুজ্জ্বল আলোকে আমাদের চোখ কিছুটা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে। আজ আমরা অনেকে মনে করছি যে ইংরেজপ্রভুরা ঘাড় থেকে নেমেছে কিন্তু ইংরেজীভূত এখনও সসম্মানে মাথার উপর বিরাজ করছে। এই বিদেশীভাষাকে তাড়াতাড়ি না ভুলতে পারলে আমাদের জাতীয় মর্যাদা হানি হবে এই আশংকা অনেকের মনে অহেতুক উঁকি দিচ্ছে। ভাবাবেগের ডানায় না ভেসে একটু ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা শ্রেয়ঃ মনে করি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সীমান্ত থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যগগন পর্যন্ত ইংরেজীভাষা ঐতিহাসিক কারণে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনে জাতীয়তার বীজ বপন ও তার নব উন্মেষের পথে সহায়তা করেছে। ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে ইউরোপ ভূ-খণ্ডে সেদিন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার কিছুটা ঢেউ বা আলোড়ন ইংরেজীভাষার মাধ্যমে আমাদের তীরে এসে লেগেছে। বর্তমান ভারতের নবজাগরণের পুরোহিতরা রাজা রামমোহন রায়, শ্রীঅরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী মাই-কেল, সুরেন ব্যানার্জি প্রভৃতি নেতারা প্রথমদিকে পুরোদস্তুর ইংরেজী সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে প্রভাবান্বিত ছিলেন। সেদিন বাইরের জগতের প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক গবে-ষণা, রাজনৈতিক আদর্শ যা কিছু আমাদের মনকে জাগ্রত ও সঞ্জীবিত করেছে সেই ভাবধারার বাহক ছিল ইংরেজী ভাষা। রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলেছেন—"ইংরাজী শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে; সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে আর যে লোক বাঁধা নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালিই হউক এই শিক্ষাকে ভ্রম, এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে।" নিজেদের ভাবধারাকে প্রসারিত ও ফলবান করবার উদ্দেশ্যে সেদিন ভারতবর্ষের মনীষীবৃন্দ সাদরে ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করেছেন। এই ইংরাজীভাষা শিখে সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধারা ইংরাজশাসনের চিরঅবসানের জন্য ইংরেজী ভাষার সুতীক্ষ্ণ তীর তৈরী করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সজোরে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁরা বিদেশী

বণিক ও ইংরেজীভাষাকে এক পর্যায়ে রেখে বিচার করেন নি। ইংরেজী আজ রাজভাষা নয়, এই ভাষা হোল আজ বহির্জগতের সাথে যোগাযোগের মিলন সেতু। ইংরেজী ভাষাকে আজ বিদেশী ভাষা বলে উপেক্ষা করি সে হবে আমাদের অন্ধ পৌত্তলিকতা। আজ ইতিহাসের দুর্নিবার গতির তরঙ্গ, যুদ্ধ ও বিপ্লবের জোয়ারে দেশ ও জাতির সীমিত প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। আজ অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সব বিষয়ে বাইরের জগতের আলোকরাশি ছড়িয়ে পড়ছে আমা-দের দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে। আমাদের দেশের ভাবধারা, দর্শন, সংস্কৃতির আলোর রশ্মি বিকিরণ হয়েছে পশ্চিম দিগন্তে। স্বজাতির অভিমান, সংকীর্ণ স্বার্থের বেড়াজাল ভেসে যাচ্ছে বিশ্বমানবের ঐক্যসাধনের দুর্বার স্রোতে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আজ সব দেশ নিজেদের দেশের ছোট ছোট দেয়াল ভেঙ্গে সারা পৃথিবীর সাথে মিলিত হবার সাধনা করছে। আমাদের অন্তরের কথা পৌঁছিয়ে দিতে হবে বিশ্বদরবারে, বাইরের জগ-তের আলো নিয়ে আসতে হবে ঘরের আঙিনায়। এই মিলনের সেতু হবে বিশ্বভাষা যার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, বিচিত্র বর্ণ, বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা ভাবের বিনিময় করবে।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীতে এতদিন ছড়িয়ে ছিল। তাদের আন্তর্জাতিক প্রভাবের সাথে তাদের তাদের ভাষা, সাহিত্য, আইন, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের নানা তরঙ্গ এমে-রিকা আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষে ও ইউরোপের অনেক দেশে প্রবাহিত হয়েছে। এতদিন সারাবিশ্বে ইংরেজী বা ফরাসী ভাষার বহুল প্রচলনের দরুণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাইরের জগতের সাথে দেশের মিলন সেতুতে এই দুইভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আজ যদি শুধু অন্ধজাতীয়তার কবলে পড়ে অথবা ভাবাবেগের বশে ইংরেজী ভাষাকে বিদেশীভাষা বলে দূরে ফেলে রাখি তবে আমরা সদাপরিবর্তনশীল ইউরোপীয় জীবনের নিত্যস্রোতা ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো।

ইংরেজী ভাষাকে যদি পরাধীনতার শৃঙ্খল বা চিহ্নরূপে দেখি সেটা হবে আমাদের পরাজয় মনোবৃত্তি। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতাকে হরণ করছে, অর্থনৈতিক জীবনের নিপীড়িত অগ্র-গতির পথে বন্ধন সৃষ্টি করেছে কিন্তু তাদের ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি আমাদের জাতীয়তার উন্মেষনের পথে সহায়তা করেছে। ইতিহাসের পরিহাস যে ইংরেজ তাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে অজ্ঞাতসারে আমাদের সুপ্তমনকে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদেরই রচিত লৌহ-কপাট থেকে মুক্তির পাবার জন্য দেশের অযুত সেনানীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা দিয়েছে।

বিজ্ঞান গবেষণা, সাহিত্যচর্চা তথা Humanistic Studiesএ পাশ্চাত্যজগত বিশেষ করে ইংরেজী ভাষার কাছে আমাদের অশেষ ঋণ রয়েছে।

ইংরেজী ভাষা তার সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবহারিক ও শিল্পবিষয়ক বিদ্যা নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে যে এতদিন অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা এই স্থান গ্রহণ না করার দরুণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনের অধিকাংশ স্রোত বয়ে চলেছে। আজ এই কথায় মনে মনে লজ্জা অনুভব করলেও সত্যকে অস্বী-কার করা অথবা ইতিহাসকে বিকৃত করে লাভ নেই। আধুনিক যুগের সাথে আমাদের পরিচয় বা যোগসূত্র হয়েছে এই ভাষার মাধ্যমে। বর্তমান যুগকে জানতে হলে অথবা তার অন্তরের আলোর কিছু কণা পেতে হলে আমাদের জাতীয় স্বার্থকে বজায় রাখবার জন্যই ইংরেজী ভাষাকে শিখতে হবে। কালের তীব্রগতির সাথে দাঁড় টেনে চলতে গেলে ইংরেজী ভাষাকে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া চলবে না। যুগধর্মী হওয়া অথবা বাইরের জগতের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সাথে একতালে চলা যে কোন কারণে ইংরেজী ভাষাকে চিরতরে জাতির অন্তর থেকে একেবারে মুছে দেওয়া

চলবে না। আজ ইংরেজী ভাষাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করার নামান্তর হবে বর্তমান শিক্ষার মানকে ক্রমশঃ নিম্নগামী করে স্বখাত সলিলে ডুবে মরা এই প্রসঙ্গে University Education Committee Commission এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য।

"English, however, must continue to be studied. It is a Language which is rich in literature—humantstic, Scientific and technical. If under sentimental urges we should give up English we would cut ourselves off from the living stream of ever-growing knowledge. Unable to have acess to this knowledge, our standard of Scholarship would fast deteriorate and our participation in the world movement in thought would become negligible. Its effect would be disastrous for practical life, for living nation must move with the times and must respond quickly to the challenge of the surroundings. English is the only means of prerenting our isolation from the world, and we will act unwisely if we allow ourselves to be enveloped in the folds of a dark curtain of ignorance ".

উপরিউক্ত কথার অনুসরণে বলছি যে ইংরেজী ভাষার তরী ছাড়া আজ বিশ্বজোড়া সদা-প্রবহমান রাজনৈতিক সামাজিক, ঘটনাস্রোতের সাথে ভেসে যাওয়া সম্ভব হবেনা। আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ সংসদে, বিদেশী দূতাবাসে, বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশ্বসম্মেলনে আমাদের জাতীয় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে সুচারুভাবে পরিবেশন করা হবে নিরর্থক। যুগের আবহাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ইংরেজী ভাষাকে আজ সযতনে শিখতে হবে অপরপক্ষে দেশের অগণিত লোকের হৃদয়ের স্পর্শ পেতে হলে দেশের নাড়ীর সাথে যে ভাষার যোগ রয়েছে সেই ভাষার পথ দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। "নানান দেশের ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?" দেশের ভাষার মারফৎ যত সহজে দেশের লোকের সাথে আপন হতে পারবো ইংরেজী ভাষার মারফৎ তা কখনও সম্ভব হবেনা। ইংরেজী ভাষার সাথে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের নাড়ীর যোগ নেই। শিক্ষিতের ভিতর এই ভাষা সীমাবদ্ধ। "আমরা ইংরেজী শিক্ষিতকেই আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়-হরণের জন্য ছলবলকৌশল সাজ সরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বদেশী সমাজ ঃ আত্মশক্তি)

দেশ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্রের ভীতি ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ ছাড়া আর কোন যোগ ছিলনা। সমাজের ওপরতলার লোকরা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও রাজ্যশাসন সর্ববিধ বিষয়ে প্রভুত্ব করে আসছে। "ভারতের অধঃপতনের প্রাধান কারণ মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আমাদের যদি পুনরায় উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই করিতে হইবে।. এই পথে প্রধান অন্তরায় হইল ভাষাগত অসুবিধা।..অতএব সমুচ্চ ভাবগুলিকে অবশ্যই মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। (স্বামী বিবেকানন্দ)

ইংরেজী ভাষাকে উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী ভাষা হিসাবে জাতির সংস্কৃতির ভাণ্ডারে দীর্ঘদিন সযতনে লালন করতে হবে সন্দেহ নাই কিন্তু তাকে চিরদিন মধ্যমণি করে বা জাতীয় ভাষার

সিংহাসনে বসিয়ে নয়। অদূরভবিষ্যতে ইংরেজী ভাষার স্থান গ্রহণ করবার জন্য প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, মালয়ালম্, তেলেগু, কানাড়ী, তামিল, মারাঠী ও গুজরাটি, ওড়িয়া প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার বাহনে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে মাতৃভাষাতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, তার ধাপ ক্রমশঃ বাড়িয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যথা মাধ্যমিক (৩ বছর), প্রথম ডিগ্রী কোর্স (৩ বছর) মাতৃভাষাকে শিক্ষাবাহনরূপে বিস্তার করা সম্ভব। ভারতীয় সংস্কৃতি ও তার অতুলনীয় ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করতে গেলে সংস্কৃত অধ্যয়নকে অনাদর করা সঙ্গত হবে না। কিছু লোক আছেন যারা সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে আগ্রহশীল, কিন্তু তারা প্রাচীন ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে সমকালীন যুগ ও পৃথিবীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। ভারতে সংস্কৃত, ইউরোপে লাতিন ভাষা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ দেশের অগণিত লোকেরও ভাব বিনিময়ের কথা ভাষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এমনকি শিক্ষার বাহন রূপে কখনও স্বীকৃতি পায়নি।

প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার সাথে সেখানকার অধিবাসীদের এক নিবিড় ও গভীর আত্মীয় যোগ রয়েছে। ভারতবর্ষে চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা, এর সাথে ইংরেজী ধরলে হবে পনেরটি ভাষা। আমাদের এই বিরাট দেশে পনেরটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করা নীতিগত কোন বাধা নেই অথবা এই কারণে জাতীয় সংহতি ভেঙ্গে অনৈক্য সৃষ্টি করবে এই ভয়েরও কোন কারণ নেই। ইংরেজী ভাষাকে চিরকালের জন্য জাতীয় ভাষার সিংহাসনে বসিয়ে অথবা একক হিন্দী-ভাষাকে বাছাই করে ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত করে দেশের আঞ্চলিক ভাষাকে হীন দুর্বল ও জাতীয় সংস্কৃতিকে অবমাননা করা হবে। আমরা মনে করি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষা, শাসন ও আইনসভার বিতর্ক সব অনায়াসে চলতে পারে। মাতৃভাষার বাহনে ছেলেমেয়েরা সহজে শিক্ষাজগতে প্রবেশ ও অনুসরণ করতে পারে, এ না হলে তাদের ভাষাকে অরণ্যে রোদন করতে হবে।

আঞ্চলিক ভাষা বেশীরভাগ নিজেদের ভৌগোলিক সীমাতে আবদ্ধ। নিজের প্রদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্য প্রদেশের অধিবাসীর কাছে জনপ্রিয় হবেনা। আমাদের "আ মরি বাংলা ভাষা" আমাদের কাছে যতই শ্রুতিমধুর হউক না কেন অসমীয়া বা বিহারীদের কাছে তেমন আবেগ সৃষ্টি করতে পারবে না। আমরা সেই অনাগত শুভদিনের প্রতীক্ষা করছি যেদিন আমাদের দেশে হিন্দী বা অপর কোন বহুল প্রচারিত আঞ্চলিক ভাষা ক্রমশঃ যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে, দেশের ও বিদেশের নানা সম্পদ আহরণ করে সৃজনী প্রতিভার সৃষ্টি ও ধ্যানে বলিষ্ঠ হয়ে বেগবান স্রোতে রূপান্তরিত হবে সেই অনায়াসে এই কথ্যভাষা ধীরে ধীরে জাতীয় ভাষায় উন্নীত হবে। তার জন্য চাই সহনশীলতা, অসীম ধৈর্য ও জ্ঞান চর্চা।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

স্প্যানিস্ রেফিউজি

পারী নগরীর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া রেফিউজি বৃদ্ধাকে কেবল সামান্য আহার্য দিয়ে পুনরায় তাকে অনিশ্চিত ভাগ্যের অন্ধকার পথে ঠেলে দিতে আমাদের হৃদয় কেমন একটা মোচড় দিতে লাগল। তাকে বাঁচাতে হলে চাই আশ্রয়, চাই আহার্য চাই মানবীয় সহানুভূতি। আমরা তাকে নিয়ে গেলাম পুলিশের থানায় যদি সেখান থেকে সাহায্যের কোন কিনারা পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা খুব ধমক খেলাম। আমাদের বলা হ'ল, বিদেশী ছাত্রদের এরকম পলিটিক্স্-এ মাতামাতি করলে এদেশ থেকে তারা আমাদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে। আমরা যখন বললাম 'একজন দুঃস্থা রেফিউজির আশ্রয়ের সন্ধানের সঙ্গে পলিটিক্স্ এর কি সম্বন্ধ ?' কোতোয়ালির কর্তা জবাব দিলেন "সব স্প্যানিস রেফিউজিরা সাল্ কমিউনিস্ত্" অর্থাৎ অতিশয় বদলোক। দু'একজন দর্শক যাঁরা আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে দেখে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন আমরা কোতোয়ালিতে চাঁরবসনা এক বৃদ্ধাকে নিয়ে কি নালিশ করতে এসেছি, তাঁদের একজন বললেন, জুভিসির কাছে 'প্যাভিয়' স্লোতে তিনি অনেক স্প্যানিস্ রেফিউজির সমারোহ দেখেছেন। সেখানে বোধহয় বৃদ্ধার একটা ঠাঁই মিলতে পারে। আমরা ঠিক করলাম সে রাতের মত এক হোটেলে মহিলাটির থাকার ব্যবস্থা করে পরের দিন তাকে প্যাভিয়' স্লোতে পৌঁছে দেব।

রিপাবলিকান্ স্প্যানিস সরকার ও ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট দলকে নিয়ে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় তাতে হিটলার ও মুসোলিনী অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য, বিমান ও বোমাবর্ষণের দ্বারায় স্পেনকে বিধ্বস্ত করলেও, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন শান্তিবাদী নিয়ন্তারা নিরপেক্ষ দর্শক হ'য়ে, এই ধ্বংসনীতির সমর্থন করেন না ব'লে তাঁরা দু একটি ভদ্রোচিত মৃদু আপত্তি করেছিলেন মাত্র। ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব রিপাবলিকের জন্ম দিয়ে জগতে স্বাধীনতাবাদী জনগণের মনে এনেছে একটা স্থায়ী আকর্ষণ। তাই যে কোন রিপাবলিক পীড়িত হ'লে সহানুভূতির জন্য সকলে মুখ তুলে চায় ফ্রান্সের দিকে। তদানীন্তন ফরাসী সরকার স্পেনের এই পীড়ন সম্বন্ধে একেবারে যে নির্বিকার নন, তাই দেখাতে, পলাতক রেফিউজিদের বিনা বাধায় সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ফ্রান্সে আসতে বাধা দেয়নি। তাদের জন্যে সীমান্ত খুলে দেওয়ার মাহাত্ম্যটুকু সংবাদপত্রের প্রশস্তিতে বেশ ভাল করে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া স্প্যানিশ রেফিউজিরা ফরাসী সরকার থেকে কোন সাহায্য পায়নি। সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে, জগতের সব দেশের চেয়েও তখন কমিউনিস্ট্দের সংখ্যা ফ্রান্সে ছিল সর্বাধিক। এবং ফরাসী রাষ্ট্রীয় শক্তির তাকে বিধ্বস্ত করার মতো সামর্থ্য না থাকায়, ফরাসী বামপন্থীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছিল। প্রকাশ্যভাবে না করলেও, পরোক্ষ ভাবে ফরাসী রাষ্ট্রনিয়ন্তারা তাদের এই পরিবর্তনকে খর্ব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। পলাতক স্প্যানিশদের ধরে নেওয়া হয়েছিল রিপাবলিকান সরকারের পক্ষপাতী অর্থাৎ বামপন্থী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, ফরাসী সরকার এই স্প্যানিশ রেফিউজিদের ক্যাম্পে গণ্ডীর মধ্যে আটকে নিয়মজারী করে তাদের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করলে অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে তাদের কয়েদ হয়ে গেল। জায়গায় জায়গায় রেফিউজিরা একজোট হতেই পুলিশের লোক এসে সেগুলি যে রেফিউজি ক্যাম্প তার ঘোষণা সরকারীভাবে করে দিল। এই হতভাগ্যদের থাকবার ও খাওয়ার

সাধ্য মতো অয়োজন কেবল বামপন্থী নাগরিক ও কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যদের কাছ থেকেই এসেছিল।

প্যাভিয়' স্লো-র ক্যাম্পে ছিল মাদ্রিদ ও বার্সিলোনা সহরের অপেরা ও সঙ্গীতালয়ের কয়েকজন সুর সংগত-কারীরা। এদের প্রযোজনায় ক্যাম্পের কিশোর ও কিশোরীদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল স্পেনের পল্লীনৃত্য-সংগীতের একটি দল। তারা জুনেস্ দাস্প্যান্ নাম দিয়ে, ফ্রান্সের সহরে গ্রামে নেচে গেয়ে ক্যাম্পের অন্তর্ভুক্ত রেফিউজিদের অন্নবস্ত্র সংস্থানের কিছুটা ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। ম্যাজোভিয়েস্কী ও আমি রেফিউজি-রিলিফ ভলেনটিয়ার-দের দলভুক্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এদের খাদ্য বস্ত্রাদির ব্যবস্থার চেষ্টা দেখতাম। ক্যাম্পে এত-গুলি মেয়েদের সমাগম ম্যাজোভিয়েস্কীর ক্যামেরাকে ব্যস্ত রাখত। আমি আমার সাধ্য মতো গ্লাম, অ্যাপল বা পেয়ার কিনে এক থলে ভরে যেতাম ক্যাম্পে এবং এই ফলের অংশ প্রত্যেক ক্যাম্পবাসীর হাতে কিছু না কিছু পড়ত। ম্যাজোভিয়েস্কী নজরে পড়া কোন মেয়ের পক্ষ-পাতীত্ব করে, আনতেন রঙিগন রুমাল, আতর এবং এর ফলে আর সকলে ঈর্ষান্বিতা হয়ে বেশ বিরূপ হত। এই সব মেয়েরা একে একে ম্যাজোভিয়েস্কীর দেওয়া জিনিস দু একবার গ্রহণ করার পর, অপরের বিরক্তি-ভাজন হবার ভয়ে, তারা যে তাঁর অনুরাগী নয়, তাই স্পষ্টভাবে দেখাতে, তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য করত। ভলেন্টিয়ারদের মধ্যে আর কেউ এই রকম বিশিষ্টভাবে একজনকে, বন্ধুত্ব বা স্নেহের ভাগ দিয়ে অন্যদের ঈর্ষান্বিত করে তোলেনি। আমরা ক্যাম্পে পৌঁছালেই, ছেলেমেয়েদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যেত। তারা সব আমাদের ঘিরে গলা কাঁধ ধরে ঝুলে চাঁৎকার করত — "ওরে এরা সব এসে গেছে।" তারপর হাত পেতে বসে যেত, যা এনেছি তা পাবার প্রত্যাশী হয়ে। একদিন ম্যাজোভিয়েস্কী আমাদের একলা পেয়ে বললেন, 'জানি না, তোমরা কি যাদুতে এদের সব বশ করে ফেলেছ—আমাকে শিখিয়ে দাও। সকলেই তোমাদের অনুগত থাক, আমি চাই কেবল একজনেরই বন্ধুত্ব বা স্নেহ। আমরা তাকে বলে বোঝাতে পার-লাম না যে, তাঁর দৃষ্টি নিয়ে আমরা কোন দিন চাইনি এই রেফিউজিদের প্রতি স্নেহ বা ভাল-বাসার প্রতিদান। ঘটনাচক্রে হতভাগ্য এদের হৃদয়কে ভাগ বাটরা করবার প্রবৃত্তি দেখান অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অশোভন।

রেফিউজি ক্যাম্পের বাইরে একটি জিপ্সীর দল ক্যারাভ্যান নিয়ে যুদ্ধ ক্ষুব্ধ স্পেন থেকে পালিয়ে আড্ডা নিয়েছিল। তারা নিজেদের রেফিউজি বলে গণ্য করেনি এবং তা কাউকে ভাবতেও দেয়নি। তারা স্প্যানিশ জিপ্সীরা হলেও ক্যারাভ্যানই ছিল তাদের প্রকৃত দেশ। স্থায়ী বাসিন্দাদের রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে তারা আকৃষ্ট ছিল না, কারণ তাদের জীবনে গণতন্ত্র রাজতন্ত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সত্তার কোন অর্থই নেই। শ্রেণীগত একটা নীতি ও আচারের খসড়াকে অবলম্বন করে চলে যায় জিপ্সীদের সমাজ ও জীবন। এদের কিশোরী যুবতীরা পথচারীদের হাত দেখে ভাগ্য গণনা করে বা নাচ দেখিয়ে, গান গেয়ে রোজগারের উপায় দেখে। যুবকেরা ক্যাফের সামনে বাজনা বাজিয়ে বা সামাজিক সম্মেলনে মেয়েদের নাচে গানে সংগত করে পারিশ্রমিক পাবার চেষ্টা করে। উপায়ন্তরে হয়ে যায় মুটে মজুর। প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারা ক্যারাভ্যানের দৈনন্দিন গোছগাছ বা রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধরা কেবল খোসগল্প বা ধূমপানে সময় কাটিয়ে দেয়। পথেঘাটে লোকের অলক্ষ্যে জিনিসপত্র হস্তান্তর করা এদের কাছে চুরি নয়। ভগবানের দেওয়া জিনিস যে নিয়ে নিতে পারে — বিনা গোলমালে, সেইটাই হয়ে যায় তার ন্যায্য পাওনা। আমি বহু চেষ্টা করেও চুরি করা পাপ এ কথা কোনমতে তাদের বোঝাতে পারিনি। তারা বলত 'ও পাপ করে কেবল সমাজের স্থায়ী বাসিন্দারা।' এদের দলপতি খুয়ান্-এর ছিল, ক্যারাভ্যানে

একাধিপত্য। যুবকদের মধ্যে আংখেলো ছিল, সবচেয়ে অলস ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। রোগা ছিপ্‌ছিপে ছিল তার চেহারা এবং একটি চোখ কানা। কিশোর বয়সে কে না কি তার স্নেহমুগ্ধা মেয়ের মুখের দিকে তাকানোর স্পর্ধা দেখানোতে, তার সঙ্গে লড়াই হয়ে যায় এবং এই ভালবাসার একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠার প্রতীক রয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বীর ছুরির ঘায়ে হারানো একটি চোখ। খুয়ান্ এবং ক্যারাভ্যানের আর সকলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। এরা বলত যদি কোন দেশকে এদের পিতৃভূমি বলে স্বীকার করতে চায়, তাহলে সে দেশ হবে হিন্দুস্থান। কারণ এদের দৃঢ় বিশ্বাস এইখান থেকেই ঘর-বিবাগী হবার কোন প্রেরণায় এদের পূর্ব পুরুষরা বেরিয়ে পড়েছিলেন দিকে দিকে বাঁধা-ধরা দেশ ও জাতির গন্ডী মুক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে। তাই কোন সুদূরে বিস্মৃত টানে আমি হয়ে গেলাম তাদের ভাই। রাত্রে গ'লে ধ্বসে-যাওয়া আলু পেঁয়াজের সুপে রুটি ভিজিয়ে নৈশাহার শেষ করে যখন তারা গিটারের তন্ত্রীতে ছোট সুরের গৌর-চন্দ্রিকা তুলত,—মনে হত যেন সাহানা, আশাবরী, গান্ধারী কী ভৈরবী সুর আত্মপ্রকাশের একটা ইশারা করে পিছিয়ে গেল। যেন চেনা কোন অবগুন্ঠনবতীর কাপড় সরে জানা-মুখের একটা ঝলক্ অন্তর্হিত হয়ে গেল আরও বড় ঘোমটার অন্তরালে। গোল হয়ে বসা দ্রষ্টা ও শ্রোতাদের দল মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে "ওলে ওলে।" হঠাৎ দু' একটি মেয়ে মাঝখানের জমিতে লাফিয়ে পড়ে, কোমরে হাত রেখে চরণাঘাতে জাগিয়ে তোলে নৃত্যের ছন্দ। হাততালি আর গিটারের সুর সংগতে সর্পিনীর মতো দুলতে থাকে তাদের দেহবল্লরী কখনো বা বেগে ঘুরতে ঘুরতে তারা হয়ে যায় ঘূর্ণি বায়ু। উত্তেজিত দ্রষ্টার দল থেকে কেউ কেউ তাদের মধ্যে পড়ে নৃত্যের সেই উন্দাম তালে মেতে যায়। যখন মনে হয় মেয়েরা নাচের তালে ছিট্‌কে পড়ে যাচ্ছে, সঙ্গী যুবকের অঙ্গ ভঙ্গিমায় কোন্ অদৃশ্য অবলম্বন যেন তাদের লুফে ধরে আবার মাটিতে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের গলায় বাঁধা রেশমী রুমালের দোদুল্যমান কোণগুলো আশে পাশের নিবু নিবু অগ্নিকুন্ডের শিখার মতো আবছা আকাশের গায়ে জ্বলে উঠছিল। এ যেন প্রায়-নির্বাপিত বিরাট ইন্ধনে কোন অদৃশ্য দৈত্য ফুঁ দিয়ে আগুনের ফুল্‌কি ছড়াচ্ছিল দিকে দিকে।

খুয়ান একদিন রহস্য করে বল্‌ল 'আমাদের এই ক্যারাভ্যানে অধিনয়াকত্ব আমাদের এই ইন্ডিও ভায়ের হাতে তুলে দিলে বেশ হয়।' আংখেলো শুনে তার ধারাল ছুরিখানা দু একবার হাতে শানিয়ে নিয়ে বলল। এই ক্যাম্পে সেই হবে দলপতি যার এই অধিকার রাখবার মতো হিম্মৎ আছে। হেসে বললাম 'ব্যস্ত হয়ো না আংখেলো, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে রাজী নই। হাজার চেষ্টা করলেও আমি জিপ্‌সী হতে পারবো না। এমন কি, তোমাদের পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়েও। এক বৃদ্ধা বিদ্রুপ করে আংখেলোকে বলল, 'কি আমার দলপতি রে! কুঁড়ের সর্দার। কেবল বসে বসে আমাদের কষ্টলব্ধ আহার্য ধ্বংস করতে মজবুত। এ পর্যন্ত একদিন এক টুকরো মাংস আনবার মুরোদ হয়নি,—পুরো একটা হাঁস বা মুরগী তো দূরের কথা।' সে উত্তর করল—'দলপতি যদি সাধারণের মতো কাজ করতে থাকে তাহলে, অন্যের সঙ্গে দলপতির তফাৎ কোথায়? আর সকলের সঙ্গে সমান কাজ করলে, অন্যে তাকে সমীহ করবে কেন? আমার কোন মুরোদ নেই বলছ? ইচ্ছে করলে, মুরগী বা হাঁস কেন, একটা বড় বলদ পর্যন্ত এনে দিতে পারি।' সেদিন সন্ধ্যায় তাদের ক্যাম্পে একটা হৈ চৈ ব্যাপার সুরু হল। কারণ পড়ন্ত বিকেলে আংখেলো এনে হাজির করেছে বিরাট হৃষ্টপুষ্ট একটি গাভী। বয়োজ্যেষ্ঠরা সমস্বরে ভৎর্সনা ও গালি বর্ষণ করছিল। গাভী তো তারা কেটে খেতে পারে না। কোন বুদ্ধিতে এতবড় অকেজো জানোয়ার ধরে নিয়ে এসেছে! আংখেলো তখন সকলের কান ফাটিয়ে বোঝাচ্ছিল

বাজেয়াপ্ত করার সময় তার কি দেখবার সময় ছিল, সেটা গাভী, না বলদ। তারা অনুযোগ করেছিল যে, সে কিছু আনতে পারে না, তাই সে প্রমাণ করেছে, তার পক্ষে একটা বড় জানোয়ার সকলের অলক্ষ্যে ক্যাম্পে নিয়ে আসা কিছু মাত্র শক্ত নয়। সকলে রায় দিল, তাকে এক্ষুণি যেখান থেকে গাভীটি এনেছে, সেখানে গিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ যদি কোন ক্রমে পুলিশ খোঁজ করে গরুটিকে ক্যাম্পে দেখতে পায়, তাহলে চুরির দায়ে হারাবে তাদের সব সম্পত্তি এবং পচবে তারা জেলে। আংখেলো বল্‌ল 'আর রাস্তায় আমায় মাল সমেত ধরলে, তারা বুঝি আমায় খাতির করে খেতাব দেবে?' খুয়ান্ বলে উঠল 'কানা সং-এর আর কত বুদ্ধি হবে! মগজে যদি কিছু সার থাকত তাহলে নিজে থেকেই ঠিক করত যে গরুটিকে সোজা নিয়ে যাওয়া উচিত পুলিশের থানায় এবং তাদের এ বোঝান খুব শক্ত নয়, যে কাদের হারানো গরু থানার জিম্মায় সে পৌঁছে দিচ্ছে। কে জানে গরুর মালিক হয়তো খুশী হয়ে তাকে কিছু বক্‌শিশও দিয়ে দিতে পারে।' আংখেলোর কোন আপত্তি টিঁকল না। তাকে যেতেই হল গরুটিকে নিয়ে নিকটবর্তী পুলিশের থানায়।

রেফিউজি ক্যাম্পে ভলেন্‌টিয়ার ছাড়া গ্রামের অনেক মেয়ে পুরুষরা আসত তাদের সাহায্য করতে। একদিন দেখি সম্পূর্ণ অচেনা একটি যুবক ক্যাম্পের মাঠে বসে, আর সবাই তাকে একটু বিশেষ সম্মান ও খাতির দেখাচ্ছে। সকলে তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্‌ল ইনি সেইনর্ বেল্‌জ্। ইন্টার ন্যাশনাল ব্রিগ্রেডে থেকে ফ্যালান্ জিস্তদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং ধরা পড়ে ফ্রাঙ্কোর জেলে মৃত্যুদণ্ডের আসামী হ'য়ে আট মাস কাটিয়ে কোন অজ্ঞাত কারণে ছাড়া পেয়ে এইখানে পৌঁচেছে। ভদ্রলোক ইংরাজী জানায়, আমাদের অসংকোচে কথা বলার সুযোগ হল। কারণ সেখানে আর কেউ ইংরাজী জানত না, বা বুঝত না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি স্প্যানিশ সরকারের পক্ষাবলম্বী ভলানটিয়ার কিনা। — বললাম 'না মশাই। আমি রাজনৈতিক পার্টির পক্ষপাতীত্ব দেখাতে এ কাজে নামিনি। দুস্থের দুর্গতি কিছুটা লাঘব প্রচেষ্টা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তিনি জানালেন যে, স্পেনের রিপাবলিকান্ সরকারের পক্ষ নিয়ে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে ছিলেন। তাদের ধারণায় আদর্শ ও উন্নত একটি রাষ্ট্রের প্রতি বিরাট অন্যায়ের দলনকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হওয়া ছিল তাদের নৈতিক কর্তব্য। ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের হাতে বন্দী হলে, মৃত্যুদণ্ডের আসামী করে তাকে আটমাস বন্দী রাখা হয়েছিল। একই দশাগ্রস্থ রিপাবলিকান সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অনেকে এই বন্দীশালায় জমা হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখলেন যে, এক স্বপক্ষের জোর গলায় গুণকীর্তন ছাড়া নৈতিক আদর্শ বলতে তাদের আর কিছু ছিল না। শত্রু পক্ষের কারাধ্যক্ষকে সিগারেট রেশনের ঘুষ দিয়ে, তাদের মধ্যে মদ ও অন্যান্য শৌখিন অভিলাষের আমদানী চলত এবং এর জন্য কোন দিন তাদের বিবেক বুদ্ধিতে লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হয়নি। অর্থের বিনিময়ে প্রাণ রক্ষার ঘৃণিত উৎকোচ ব্যবস্থায় এই আদর্শবাদী রিপাবলিকানদের যে তৎপরতা দেখা যেত তাতে ইন্টার ন্যাশনাল ব্রিগেডভুক্ত ভলেন্‌টিয়াররা স্তম্ভিত হয়ে অনুশোচনা করতেন যে, কেন তাঁরা এই চরিত্রহীন লোকগুলকে বাঁচাতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন। কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একটি ষোল কি সতের বছরের ছেলে ছিল। তার কোন অপরাধ ছিল না। পলায়মান শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে, তাদের হদিশ না পেয়ে, ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা এই ছেলেটিকে ধরে নিয়ে আসে এবং তাকে ধমকায় শত্রুপক্ষের খবর বলে দেবার জন্যে। বেচারী কিছু না জানলেও, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে শত্রুর সংবাদ সে গোপন করছে। অতএব তাকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। কারাধ্যক্ষ উপযুক্ত অর্থের উৎকোচ পেলে তাকে ছেড়ে দেব বলায়, ছেলেটির আত্মীয়-

স্বজন বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের জন্য যেদিন ধার্য ছিল, সেইদিন সকালে বন্দীশালার সামনে তাকে গুলি মেরে নিধন কার্য শেষ করা হল। বেচারী শেষ পর্যন্ত নির্দোষী বলে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে, যখন দেখেছিল তারা তার অনুনয় শুনবে না, তখন সে বেশ সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছিল বাগিয়ে ধরা রাইফেলের সম্মুখে। কোন এক পাশবিক আনন্দকে চরিতার্থ করতে, সব কয়েদীরা যাতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখতে পায়, তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্ষুব্ধ রুষ্ট এই বেলজিয়ান্ ভদ্রলোক কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ' তোমার চাওয়া উৎকোচের অর্থ দিয়েও, কেন এই নির্দোষ যুবকটির প্রাণ-রক্ষা হল না। তোমাদের বিবেকে প্রতিশ্রুতির কি কোন মূল্য নেই এবং অর্থ লোলুপতায় মানবধর্মের সবটাই কি তোমরা বিসর্জন দিয়েছ?' কারাধ্যক্ষ বেশ নির্বিকার ভাবে বলল 'ওকে মুক্তি দিতাম ঠিকই এবং ওর বদলে এক বৃদ্ধ বন্দীকে বধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সে ওর চেয়ে অনেক বেশী অর্থের উৎকোচ আমাদের দিয়েছে, কাজেই কি কারণ দিয়ে তাকে যমালয়ে পাঠাই বল। উপর থেকে হুকুম এসেছিল যে, ঐ দিন প্রত্যুষে ছয়জন আসামীর জীবন-পাত হওয়া চাই এবং সকলে যাতে এই নিধন কার্য দেখতে পায় তারও নির্দেশ ছিল — এতে রিপাবলিকান্ পার্টির পক্ষপাতী লোকেদের মনে ত্রাসের সঞ্চারে, তাদের শুধরানোর একটা মোক্ষম চিকিৎসা হয়ে যাবে। রিপাবলিকান সৈন্যদলভুক্ত কয়েদীরা অনেকে তাঁকে এইভাবে কারা-ধ্যক্ষের সঙ্গে বচসা করতে দেখে, বেলজিয়ান্ ভদ্রলোককে ধরে একপাশে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল— 'আরে তুমি একটা নিরপরাধ যুবককে মারা হয়েছে বলে এত বিচলিত হচ্ছ কেন? যুদ্ধের সময় এ রকম হত্যাকাণ্ড হওয়া স্বাভাবিক।' তিনি বললেন 'যুদ্ধ হচ্ছে বলে উৎকোচ গ্রহণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও নিরপরাধের নিধনকে বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে হবে? জানি না, তোমাদের দেশের লোকদের কি করে এমন পাষণ্ডদের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি থাকতে পারে।' তারা জবাব দিল, তুমি যে দেশ থেকে এসেছ, তারা অত্যন্ত জড় ও নির্বিবাদী। তাই তোমরা বিপ্লবের স্বরূপকে ভাল করে জান না। স্পেনে কোন কারণকে লক্ষ্য করে জীবন দেওয়া বা নেওয়ায় কোন লজিক দেখবার প্রয়োজন হয় না। আজ যদি আমরা হতাম বিজেতা, আর এরা থাকত আমাদের কয়েদী তাহলে আমরা আরও বেশী করে হত্যার ব্যবস্থা করতাম এবং আরও নৃশংস-ভাবে — যাতে এঁদের পক্ষের আর কেউ কোন দিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে।' এই কথা শুনে তিনি যে আদর্শের প্রেরণায় এসে ছিলেন স্পেনে জীবন দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করতে, তা ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'জান আজ আমি এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করেছি একটা জাতি যখন অধঃপাতে যায় তখন তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নামের সঙ্গে যে কোন উচ্চাদর্শকে জড়িয়ে নিলেও যুদ্ধমান সেই দলগুলির উদ্দেশ্যে কোন তফাৎ থাকে না। সাধারণ অধঃপতনের মাত্রা তাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে দেখা যায়। তাই আজ জানি রিপাবলিকান পার্টি বা ফ্রাঙ্কোর ফ্যালান্‌জিষ্ট—যারাই স্পেনের নিয়ন্তা হোক, ফল হবে একই। কোন্ ভাগ্যের জোরে জানি না, আমি ও আমার এগারজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্ধুদের, ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে মুক্তি হয়েছে। মিথ্যা আদর্শের মরীচিকায় শুধু শুধু আমাদের জীবনপাত হয়নি বলে আজ আমি নিজেকে মনে করি ধন্য।' বললাম এত সুন্দর নাচে গানে ভরা যে জাতির প্রাণ, তা কি করে হয় এত ধ্বংসপ্রবণ ও নিষ্ঠুর? ইন্‌কুইজিসন থেকে আরম্ভ করে নৃশংসতার প্রবাহ যেন স্পেনে থামতেই চায় না।' তিনি বললেন 'নিষ্ঠুরতাকে আমি জাতিগত প্রকৃতির একটা অঙ্গ বলে স্বীকার করতে না চাইলেও বাস্তবে বোধ হয় সেটা সত্যি। সাধারণতঃ অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয়ে থাকে। একটা দেশ থেকে অভাব তুলে নাও, উৎপীড়নও উঠে যাবে। আর অভাব তো কেবল মানুষেরই

তৈরী না, প্রকৃতিও কোন কোন দেশে দানের প্রাচুর্যে অধিবাসীদের জীবনকে ভরিয়ে দেয় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে; আবার কোথাও নির্জলা নিষ্ফলা হয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের স্বভাবকে করে দেয় রুক্ষ ও নীরস। স্পেনের নাচ গান যদি ভাল করে দেখ ও শোন, তাহলে বুঝবে তার আপাত আনন্দ উচ্ছ্বাসের নীচে যেন নিপীড়িতের আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে। এ সব দেশে কথার মাত্রায় ঈশ্বরের নাম স্মরণ যখন লোকে করে তাই শুনলেই জাতিগত প্রকৃতির একটা ধাঁচ বুঝতে পারবে। যখন জার্মান বলে 'মাইন্ গট্' কি ইংরাজ বলে 'মাই গড্' তা শুনে মনে হয় তারা কোন বিচারককে সাক্ষী মানছে আর ফরাসীর বলা 'মা দিয়ো' শুনে অনেক সময়ে ভুল হয়ে যায় যে বলছে 'মা ভিয়ো'। কিন্তু যখন স্প্যানিয়ার্ড বলে 'মাদ্রে দিয়স্' ঐ কথাটুকুর টানে মনে হয় তার অন্তরাত্মা চেঁচাচ্ছে 'হে মাত দেবতা আমাদের ত্রাণ কর, ত্রাণ কর'। তাই বলি বন্ধু, যদি সাধারণ মানবধর্মের প্রেরণায় আজ তুমি এই রেফিউজিদের ক্লেশ মোচনের প্রচেষ্টায়, এদের মধ্যে এসে থাক, জাজ্বল্য রেখে দাও সেই প্রেরণাকে। কিন্তু সাবধান, এদের বাক্যজালে জড়িও না নিজেকে এদের রাজনৈতিক ন্যায় ও অন্যায় বিচারে সমর্থনে ও তার বাস্তব পরীক্ষায়। অধঃ-পতিত জাতির বহু প্রায়শ্চিত্তের পর আসতে পারে হয়ত আবার মানবধর্মে বিশ্বাস এবং সেই জাতিকে বাঁচাতে হলে আবার একদিন না একদিন নিতে হবে এরই আশ্রয়। আমরা অপেক্ষা করব সেদিনের জন্য এবং সেই ক্ষণ এলে পরে আমরা উজাড় করে ঢেলে দেব আমাদের সব কিছু, আমাদের আদর্শকে সফল করতে এবং তার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করতে।'

বাংলার সারি গান

জয়দেব রায়

বাঙলা দেশের উদ্দীপনাময় পল্লীসঙ্গীতের মধ্যে সারি গান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। দেশের বীর্যগরিমামণ্ডিত অতীতের ঐতিহ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছে সারির ন্যায় যৌথপদক্ষেপ-সঙ্গীত (March Songs)। এককালে বাঙলার দুঃসাহসী নাবিক দল বঙ্গোপসাগর এমন কি ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়া বেড়াইয়াছে। এ দেশের নৌ-সৈন্যগণ সিংহলে বিজয়পতাকা উড়াইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালী সওদাগরগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে রাশি রাশি পণ্য বহন করিয়া আনিয়াছে, শ্যাম-কম্বোজ-যবদ্বীপে শিল্প ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশ গঠন করিয়াছে—তাহাদের সেই বিজয়যাত্রায় উদ্দীপনা যোগাইয়াছে রূপান্তরে এই সারি গান। বড় বড় ময়ূরপঙ্খী নৌকা তাহাদের পণ্য বহন করিত, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হইত ছিপ নামক এক শ্রেণীর নৌকা। সে দিনের সেই গৌরবময় যুগের অবসান হইয়াছে, কিন্তু নদীমাতৃক বাঙলার নৌ-জীবনে উদ্দীপনা আজও তেমনই রহিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের নদীনালার বাইচ খেলা আজও চলে এই ছিপের সাহায্যে। এই নৌকাগুলি লম্বায় ২৫।৩০ হাতের কম কোনটিই নয়, কিন্তু প্রস্থের দিক হইতে এত সংকীর্ণ যে পাশাপাশি দুইজন বসিতে পারে না, এইগুলি দুই দিকে দ্রুত বৈঠা চালায় বিদ্যুৎ গতিতে জলপথ অতিক্রম করিতে পারে। বাঙলার লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কবি শ্রীযতীন্দ্র সেন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বাঙলার নৌশিল্প যে এক সময়ে সমৃদ্ধ ছিল এবং বাঙলার নাবিকেরা যে নৌ-চালনায় প্রশংসনীয় দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আজকালও পূর্ববঙ্গের বিশেষতঃ ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী ও সমুদ্রের নিকটবর্তী জেলা সমূহের মুসলমান অধিবাসীগণের এক বৃহৎ অংশ জাহাজের খালাসী, সারেঙ, যুগানী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে। বাঙ্গালী নৌ সেনারা এক সময়ে সমুদ্রের জলরাশি অতিক্রম করিয়া, হয়ত সারিগান গাহিয়া গাহিয়াই নানা দিক্‌দেশে ছড়িত, তাহাদের গানের সুরের যে সামান্য রেশ বাঙ্গালীর কণ্ঠে ছিল, তাহা নদনদী শুষ্ক হওয়ায় নৌ চালনার অসুবিধার জন্য দারিদ্র ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জন্য আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।"

বাঙলা সাহিত্যের সেই আদিযুগে শুরু হইয়াছিল 'কে-না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে'— তাহার পর হইতে বাঙালা সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান অবলম্বনই হইয়া আছে সেই বংশীরব। সারিগানেও সেই বংশীরব ধ্বনিত হইয়াছে—

ওরে ললিতে
এত রাত্তিরে বাঁশী বাজায় কে?
তারে, ডাক দে।।

এই 'ডাক দে'র সঙ্গে সঙ্গে এক যোগে সব কয়টি বৈঠা জলে ছপাৎ করিয়া পড়ে।

বাঁশীর সুরেতে রে হরে নিল প্রাণ।
আমি সীন্তার সিন্দুর বান্ধা থুয়্যা
শোনব বাঁশীর গান॥

তারপর আবার বৈঠার আঘাত —

বাঁশীর সুরেতে রে হরে নিল প্রাণ।
আমি আখের কাজল বান্ধা থুয়্যা
শোনব বাঁশীর গান।

এইভাবেই নৌকা বেগে বহিয়া চলে।

প্রাচীন বাঙলা দেশের আদিরসাত্মক গানমাত্রই রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত হইত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন — "আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের গান লিখিতে গেলেই রাধা কৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধা কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন। পাঁচালীও য়ালারা এই কাজ করিতেন, কবিওয়ালারাও করিতেন, ঝুমুরওয়ালারাও করিতেন, তরজাওয়ালারাও অনেক সময় করিতেন।"

কেবল তাঁহারাই নয়, লোকসঙ্গীতকারদেরও অধিকাংশ প্রেমগান রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই রচিত —

কোন বনে বাজে বাঁশী রে, —
ও বাঁশী রাধার পরাণ রে ঘরে রইতে দিল না॥
তরলা বাঁশের বাঁশী তাতে সপ্ত ছেঁদা,
কদম্ব হিলানে বাঁশী বলে রাধা রাধা।।
বাঁওয়ার বাঁশী নয় রে কালিয়া নাগের বিষ।
বাঁশীর মধ্যা থাইক্যা নাগরে দেয় রে দারুণ শিষ।।

সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রত্যেক মাত্রায় জলে বৈঠার তাল চলিতে থাকে।

রাধাকৃষ্ণের যমুনাপুলিনের লীলাবিলাসও সারি গানের অন্যতম বিষয় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের সেই নৌকাখণ্ডের লীলার অনুসরণে নিম্নের সারি গানটির রচনা, নৌকার সঙ্গে জড়িত থাকায় এই সকল উপখ্যান সহজেই সারিগানের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে—

তুমি তো সুন্দর কানাই তোমার ভাঙা না;
কোথায় রাখব দইয়ের পশরা; কোথায় রাখব পা।।
শুনে কানাই বলে তখন, শোন রসবতি;
ভরাকালে ভরা গাঙে এলে কেনে যুবতি॥
আগা নায়ে রেখে দই মাঝখানেতে বস।
ফুটিক্ ফুটিক্ ফেল জল লজ্জায় কেন ভাস।।

সাধারণতঃ সারিগানের ও সেই সঙ্গে নৌকা-বাইচের মরশুম আসে দুর্গা পূজার ভাসানের সময়ে; সারা বৎসরের যত গান যেন এই সময়ের জন্যই হইয়া থাকে। মুসলমান মাঝিমাল্লারাও এসময়োপযোগী করুণ সুরের সারি গান রচনা করে —

কোথায় ফেলে গেলি এ-সব, ওমা দশভূজা।
সোনার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি চলিল কৈলাসে।
হাঁস মোষ দিয়ে মাগো কল্লেম তোর পূজা,
মাগো, কার বাড়ী গিয়াছিলে কে করেছে পূজা॥

এই দিন ও বিশ্বকর্মা পূজার দিন পূর্ববঙের বহু নদী-নালায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনু-

স্থিত হয়; বৈঠার তালের সঙ্গে সঙ্গে মনের ছন্দও সমান তালে বাজিতে থাকে। এই সময়ের জন্য রচিত গানগুলিতে আছে কতকটা সামাজিক উদ্দীপনা —

হেইও, চল্ চল্ নাও হেইও।
চল্ চল্ নাও চালাইয়া চল্।
চল্ চল্ চল্ ময়ূরপঙ্খী চল্।
চল্ চল্ উড়ান দিয়া চল্।
চল্ চল্ বাইচ খেলাইয়্যা চল্ হেইও।।

তাহাছাড়া অন্যান্য সারিগানেও সময়ে সময়ে সামরিক উদ্দীপনার সুর ধ্বনিত হয়। পশ্চিমাকাশে অন্ধকার করিয়া ঝড় আসিতেছে তুফান উঠিয়াছে, পীর গাজীর নামে 'বদর বদর' ডাক ছাড়িয়া শক্ত হাতে হাল চাপিয়া দ্রুত বেগে দাঁড় বাইতে হইবে—

আরে ওই,
পশ্চিমেতে আঁধি উঠছে উড়ছে ঝড়ি ভাই,
হুঁসিয়ারীতে চোট চেপে কসে ধরো হাল।
নঙ্গর জলদি কোরে দরিয়ায় ঢাল ।।
(কোরাস হুঙ্কার হো, হুরুর হো, হরুর হো, হো, হো-হো।
সামাল সামাল পাল ছিঁড়িল, ঘট্‌ল কি জঞ্জাল।।
দরিয়ার পীর গাজীর বদর সবাই মুখে বল,
নঙ্গর জলদি কোরে দরিয়ার ঢাল ।।
(কোরাস)—হুরুর হো, হুরুর হো .....।

সারিগানের অন্যতম মূলসুর কারুণ্যের। উদ্দীপনাময়-সুরটি সাময়িক, প্রতিযোগিতার অবসান হইলে দলছাড়া হইয়া যখন মাঝি তাহার খেয়া লইয়া উজানে পাড়ি দেয়, তখন আর তাহার মনে সেই আনন্দের রেশ নাই, পদ্মার উদ্দাম প্রকৃতি সন্ধ্যার ছায়াম্লান পরিবেশে তাহার মনে বেদনার ছায়াপাত করে ভাটিয়ালীর ন্যায়ই সারির করুণ সুর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

পাগল করিলু বাঁশী রে, বাঁশ নয়, বাঁশালী নয় রে
তরলার বাঁশের আগা।
এপার থেকে বাজাও বাঁশী রে, ঐ পার থেকে শুনি।
কেমনে হইর পার আমার কোলে যাদুমণি ।।

উদ্দাম উচ্ছল সুরে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ পদ্মার দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি তাহাদের উন্মনা করিয়া দেয়। চড়া ও খাদে একই সঙ্গে দুইটি সুরধর্মিন সারিগানের বৈশিষ্ট্য —

হো ঐ দেখ্ কে যায় রে?
(নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া রে)
জিজ্ঞাস কইর‍্যা দেখ্ তারে কোন বা দেশী নাইয়া।
বাইছালী খেলাইয়া মধুর সুরে যায় গান গাইয়া রে ।।

সারি গানের সুরের সঙ্গে বাঁশী যেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। অধিকাংশ গানেই থাকে হয় বংশ, না হয় বংশীধরের কথা। নৌকায় দাঁড় টানিতে টানিতে অথবা হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিবার সময়ে বাঁশী বাজাইবার অবশ্য কোন সুবিধা নাই।

সারি সাধারণতঃ দ্রুত লয়ের জলদ্ ছন্দের পান। কিন্তু এক শ্রেণীর সারির সুর স্বভাবতই উদাস করুণ, অকূলে স্রোতের টানে তরী ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিমগগণের অস্তগামী সূর্যের দিকে

চাহিয়া মাঝিরা গায় —

সুন্দরী লো বাইর ওইয়া দেখ্
শ্যামের বাঁশী বাজাইয়া যায় কে?
অষ্ট আঙ্গুলে বাঁশী না-রে মধ্যে মধ্যে ছেঁদা,
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।
মরাল বাঁশের বাঁশী না-রে তরই বাঁশের আগা,
অবলা নারীর জানে দিল কত দাগা ।।

এই গানগুলির সঙ্গে বাঁশী বাজানো হয়। এই অঙ্গেরসারির সুরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে ব্যবহার করিয়াছেন। এই অঙ্গের গান বেশ ধীর লয়ে গাওয়া হয়।

সারিগানের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিরহের আক্ষেপ ছাড়া অন্য বিষয়ও কিছু কিছু আছে। নবদ্বীপের নিমাইচাঁদ পদ্মানদীর মাঝিদের সারিগানেরও নায়ক; তাঁহার আসন্ন সংসারত্যাগে শচীমাতা ব্যাকুল হইয়া শুধাইতেছেন —

মা বলিয়া কোলে আয়রে।
মায়ের সমান আর আছে কেবা।।
সন্ন্যাসী না হইও রে নিমাই,
সন্ন্যাসী না হইও।
অভাগিনী শচীরাণীর মা বলে ডাইকিও।।
ঘরে আছে বিষ্টুপিয়া একবার ফির‍্যা চাও।
কাঞ্চা বয়সের সোনার নারী কারে দিয়া যাও।।

মাতার কণ্ঠে ঠিক এই একই অনুনয় সারা বাঙলার বিভিন্ন গানেই ধ্বনিত হইয়াছে।

নাটোরের দানশীল রাণী ভবানীর ধর্মপ্রাণতাও সারিগানের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে—

আরে ওরে মাঝি বসে ভাবিস কি?
ধান দূর্বা লয়ে হাতে দাঁড়ায়ে আছে ঝি ।।
ভাল দূর্বে চিনি রামসায়রের ধারে।
তারাদেবী রাণীর মেয়ে দাঁড়ায়ে পথের ধারে ।।
দশভুজা করে পূজা প্রসাদ লয়ে হাতে।
দশমীর আরতি দিতে দাঁড়ায়ে আছে পথে।।

সারি মূলতঃ পুরুষদের কণ্ঠেই নদীবক্ষে গীত হয়। তাহারাই যখন আবার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়া আসিয়া নিভৃত গৃহে বিশ্রামসুখ উপভোগ করে, সেই সুরের প্রতিধ্বনিই তাহারা গৃহপ্রাঙ্গণে প্রণয়িনীদের আকুল কণ্ঠে শুনিতে পায় —

সোনা বন্ধুরে, পিরীত করা‍্য ছাড়া‍্য যাইওনা।
পিরীত করা‍্য ছাড়া‍্য গেলে দেহে পরাণ থাক্‌বে না।।
পিরীত রতন, পিরীত যতন, পিরীত গলার হার,
পিরীত করা‍্য যে জন মর্‌ছে সফল জীবন তার।।
পিরীত রতন, পিরীত যতন, পিরীত বড় লেঠা,
ছাড়াইলে ছাড়ানি যায় না টেংরা মাছের কাঁটা।।

টুসু গানের ন্যায় এ শ্রেণীর সারিগানেও নানা সাংসারিক কথা আসিয়া পড়িয়াছে। পদ্মা-মেঘনার

উপর গীত এ সকল গানে মাছের কথা নিতান্তই স্বাভাবিক।

মুসলমান মাঝিমাল্লাদের কণ্ঠে বাৎসল্যরসটিও সংগীতের মধ্য দিয়া বিগলিত হয়। গোকুলের নন্দরাণী অতি সহজেই তাহাদের মাতা যশোদারূপে দেখা দিয়াছেন। নন্দদুলালের দৌরাত্ম্যে যশোদা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ব্রজগোপাল ননী চুরি করিয়া পলাইতেছেন, পশ্চাতে হাতে লড়ি লইয়া মাতা তাড়া করিলেন — সব মিলিয়া গৃহসংসারের একটি পরম রমণীয় চিত্র—

ওহে নন্দ গেল বাথানে, যশোদা গেল জলে,
খালি ঘর পা'য়া কিষ্ণ ননী চুরি করে।
ওহে ঘরে ঘরে বেড়ায় কিষ্ণ ননী নাহি পায়।
ছিকায়ে নবনী ভাণ্ডে দেখিবারে পায় ।।
ওহে ছেঁদন ছিঁড়িয়া কিষ্ণ সকল ননী খায়,
ওহে হাতে নড়ি নন্দরাণী পিছে পিছে ধায়।
গোকুল ভুবনে কিষ্ণ পলাইয়া যায়।
(কোরাস) ফুলকে পরায় গলায়।।

সারি গানের সুর সম্পূর্ণরূপে সমবেত কণ্ঠের উপযোগী করিয়া রচিত। নৌকায় সারি দিয়া বসিয়া গান গাওয়া হইতেই এই সুরের নাম সারি হইয়াছে।

সাধারণতঃ সারি গানে দুইটি ভাগ থাকে — একটি একক কণ্ঠের বা 'পয়ার' ও অপরটি সমবেত কণ্ঠের বা 'ধুয়া'

একক—ওহে কি করিব কোথায় যাব, কতই উঠে মনে,
অন্তরে প্রেমের ধারা বহিছে রাত্রিদিনে
ধুয়া বা কোরাস — প্রাণ ত ছিনিল রে ছিদাম ভাই
চল ভাই সকলে মায়ের কোলে যাই।।

একক কণ্ঠের বা পয়ারেও একটি লাইনের বেশী একজনের গাহিবার অধিকার নাই, পরের লাইনটি আবার পরবর্তী জন একক কণ্ঠে উদ্গীত করে। সব মিলিয়া সারি গানে রীতিমত টিম ওয়ার্ক আছে। সারি গানের সুর ভাটিয়ালী ঢঙেরই, তাহা সত্ত্বেও এই সুরের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, সারি গান পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভাটিয়ালীর ন্যায় সারি গানের সুর তেমন এক টানা নয়, একটি নিজস্ব ছন্দের সৃষ্টি করে। স্থলের উপরে এ সুর যেন আপন স্বাভাবিকতা হারায়!

জলের ছলছল্ সুরের সঙ্গে তাল রাখিয়া সারি গানের টানে পানসি যেন তরতর করিয়া বহিয়া চলে —

উজান মুখে চালাও পানসি দরিয়ার।
ঈশান কোণে ম্যাঘ উইঠ্যাছে।।
লাওয়ের বাদাম নিলে তায়।
টল্‌মল্ ছল্‌ছল্ আগে চল, আগে চল ।।
বাউরি বাতাস লাগে আইস্যা
কালাপানির গায় —
ঢেউয়ের মুখে হালের দড়ি
ছিঁড়ল বুঝি হায়।
গুরুর নামে সিঁন্ন দিব রসুলে পীরের দরগায়।।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ কথাগুলো বড় বেশী মনে পড়ে। ধীরে ধীরে ওঠে মৃগনয়নী। অন্ধকার উঠোনে এগোয় ও। ছেলে কোলে নিয়েই এগোয়। তরঙ্গিনীর ঘরের কাছে যায়। ঘরের ভেতরটা আধা অন্ধকার। বোধহয় প্রদীপ জ্বলছে। একটু দাঁড়ায় মৃগনয়নী। একটুও বাতাস নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ে না। এই গরমে দোরটা ভেজান। উঃ! নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না! আরও একটু এগোয়। কোলের ছেলেটা কেঁদে ওঠে। তবু ভেতর থেকে কোন সাড়া পায় না। ঘরের দরজাটা ঠেলে ঢোকে ভেতরে। তরঙ্গিনী বসে আছে চৌকীর ওপর। মেঝের ওপর সেই মালিনী। দুটো হাঁটুর ভেতর মুখটা গুঁজে বসেছিল। হয়ত ঝিমোচ্ছিল। দরজার শব্দ পেয়ে মুখ তোলে। তাকায়। চোখদুটোয় একটু বিস্ময়, একটু সময়। চিনতে কি কষ্ট হচ্ছে? মৃগনয়নী বেড়ার দিকে তাকায়। সোজা তাকাতে পারে না তরঙ্গিনীর দিকে।

—কেরে? অ, আয়। বোস। মৃগনয়নী এতক্ষণে তাকাতে পারে আস্তে গিয়ে বসে। ওকে একটু ধর ত দিদি। কাপড় খুলে দিয়েছে। কি দুষ্টু হয়েছে!

ছেলেটাকে কোলে দিতে চায়। তরঙ্গিনী তাকায়। বুকে বিঁধে যায় সে চাউনী। বলে,—না, থাক। মৃগনয়নীর কানদুটো রাঙা হয়ে ওঠে, গরম হয়ে ওঠে। ছেলেকে আবার নিজের কোলে চেপে নিয়ে বসে। কথা বলতে পারে না। তরঙ্গিনী আস্তে আস্তে বলে,—হঠাৎ কি মনে করে এলি?

—এমনি।

—এমনি নয়।

মৃগনয়নী বলে,—একটা কথা বলতে এলাম।

—কি?

একটু চুপ করে থেকে ভেবে নেয় মৃগনয়নী। বলেই ফেলে,—কেন এমন হোল বলত দিদি? মৃগনয়নীর গলাটা একটু কেঁপেছিল, একটু রুদ্ধ হয়ে এসেছিল বলবার সময়। তরঙ্গিনী ওর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার স্বরে বলে,— কিছু অন্যায় ত' করিনি।

—এটা কি ভাল?

—খারাপ বলে ত' একবারও মনে হয়নি আমার।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। তরঙ্গিনী একটু ভেবে বলে,—দ্যাখ, একটা একটা কথা তোরা ভুলে যাস। আমি মেয়েমানুষ। মনে মনে প্রশ্ন জাগে, আরও ত' মেয়েমানুষ আছে! মুখে কিছু বলেনা মৃগনয়নী। তরঙ্গিনী বলে,— মাঝে মাঝে মনে হয়। আমার রক্ত বড্ড লাল আর বড্ড গরম। অন্য মেয়েদের মত ফ্যাকাশে নয়। মৃগনয়নী তাকায় দিদির দিকে। একটা নিশ্বাস ফেলে তরঙ্গিনী,—আমি জানি, তোরা আমায় ঘেন্না করিস।

—না, না। — প্রতিবাদ করতে চায় মৃগনয়নী।

—থাম্। বাজে কথা বলিসনি। তোদের ঘেন্না আমার গায়ে লাগে না। আমি নিজেকে নিজে ঘেন্না করিনি। আজও করিনা।

মৃগনয়নী বিস্ময় বোধ করে। এ ধরণের কথা দিদির মুখে ও কখনও শোনেনি। ও বলতে চায়, তোর জন্যে বড় কষ্ট হয় দিদি। কিন্তু বলতে পারে না। তরঙ্গিনীও কথা বলে না। খানিক পরে একটু হালকা হবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী।— কি খেলি আজ ?

— কিছু না।

— উপোস ?

— হ্যাঁ, প্রায় রোজই ত' এমন হচ্ছে।

ভাল করে তাকায় ওর দিকে। দিদির শরীরটা অনেক শুকিয়ে গেছে।

তরঙ্গিনী বলে,— একটা কথা রাখবি ?

— কি ?

— বল রাখবি ?

— রাখব।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে তরঙ্গিনী,— একটু কাসুন্দি দিয়ে আম মেখে খাওয়াবি ?

— কবে ?

— এই ধর, কাল, পরশু।

— খাওয়াব। কেন এখানে — ?

—এখানে কাকে আর বলব। কেউ ত' আসে না।

চোখদুটো এতক্ষণে চিক্‌চিক্‌ করে তরঙ্গিনীর,— কেউ আসে না। কেউ না। টস্‌ টসে হয়ে ওঠে চোখদুটো। জলে ভরে যায়। একটু ভেবে বলে, — যাক্‌ তোকে আবার কেউ যদি বকে ?

— কেউ জানবে না।

— কাসুন্দি কোথা পাবি ?

— আমার জন্যে চেয়ে নেব কর্তামার কাছে।

— তোকে দেবে না। ছেলে কোলে। ওর পেট কামড়াবে।

— তবে গয়লা বাড়ীর বৌয়ের কাছ থেকে আনাব।

— কাকে দিয়ে ?

— হৃদয়দাকে দিয়ে।

— হৃদয়দা যদি বলে দেয় কাউকে ?

— হৃদয়দা আমায় ভালবাসে। বলবে না।

তরঙ্গিনীর মুখটা আবার শুকিয়ে যায়,— আপন মনেই বলে,— আর আমার এখানে দা' নিয়ে পাহারা দেয়। জানে মৃগনয়নী। কথা বলে না।

— এবার উঠি দিদি।

— আসিস কিন্তু কাল দুপুরে। একটু টক্‌ খাবার জন্যে প্রাণ যায়!

এমন অবস্থায় এমন হয়। টক খেতে কি ভাল যে লাগে! জানে মৃগনয়নী। ধীরে ধীরে ওঠে। তরঙ্গিনী ওর হাত ধরে। এতক্ষণে ছোঁয় ওকে।

— এবার যাই দিদি!

হাতটা ছেড়ে দেয় তরঙ্গিনী। চোখদুটো স্তিমিত হয়ে আসে। তেমনি বসে থাকে। মৃগনয়নী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসে।

পরদিন সকালে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত। ফিস্‌ ফিস্‌ কাণাকাণি চার-

দিকে। ঘাটের দিকে যেতে হবে। কাপড় আনতে মায়ের ঘরের কাছে গিয়ে দেখে মায়ের ঘর তখনও বন্ধ। কি হোল ? মা ওঠেনি।

— ও বৌঠান, মা ওঠেনি ?

— উঠেছিল। আবার শুয়েছে।

— কি ব্যাপার বলত ?

বৌঠান চারদিকে তাকিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলে,— জান না, বড় ঠাকুরকন্যা কাশী চলে গেছে।

— কখন ?

— আজ ভোর রাতে।

— আজ ভোর রাতে!

বৌঠান ততক্ষণে চলে গেছে। পাদুটো অবশ লাগছে। একটু জোর নেই আর পাদুটোয়। ঘরে গিয়ে তবু একখানা গামছা নিয়ে ঘাটের দিকে এগোতে যায় মৃগনয়নী। মনে হয় বাবার কথা। বাবা কি জেনেছে ? কে জানে, বাবার কি অবস্থা আজ। আস্তে আস্তে বাইরের দিকেই মৃগনয়নী এগোয়। ভেতর বাড়ী পার হয়ে বাইরের ঘরের কাছে আসে মৃগনয়নী। বাবা ঘরেই রয়েছেন। পিছন ফিরে বসে রয়েছেন। জপে বসেছেন হয়ত। আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে একটু দেখতে যায় মৃগনয়নী।

— কে ?

মৃগনয়নী চমকে ওঠে। রামতারণ মৃগনয়নীকে দেখে। আর কথা বলে না। আবার বসেন তেমনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। কিছু বোধহয় খুঁজছেন আকাশে। ভাল করে তাকায় মৃগনয়নী। জপের মালাটা নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। মালাটি রেখে আবার চুপ করে বসেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। মৃগনয়নী কাছে যায়।— রামতারণ ফিরে তাকান। একটু হাসেন। তেমনি স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু কথা বলেন না। কথা মৃগনয়নীও বলতে পারে না। ঘাটের দিকে চলে যায় আস্তে আস্তে হেঁটে। আমরাগাছটা পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ে কচি আমে ভরে গেছে গাছগুলো। চোখদুটো অকস্মাৎ ঝাঁপসা হয়ে আসে। আম দেখা যাচ্ছে না। কাসুন্দি কর্তামার কাছে। তাও ঝাঁপসা মনের ওপর। আমা মাখা। খুব টক্‌! কাসুন্দি দিয়ে মাখা! সব ঝাঁপসা হয়ে গেছে। আর ভাবতে চাইছে না মৃগনয়নী। ঝাঁপসা চোখদুটো ডলতে ডলতে ভেতর বাড়ীতে চলে আসে। ঘাটে যাবে ও। দিদির সেই ঘরের পিছনে ঘাটে যাবে। কি করে যাবে ? ও ঘরের সামনে দিয়ে কি করে যাবে ? দ্রুতপায়ে ঘরে আসে আবার। বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে। উপুড় হয়ে। বালিশটা ভিজে উঠতে থাকে।

চোদ্দ

মাসের শেষে সমস্ত বাড়ীটা যখন অসহ্য হয়ে উঠছিল মৃগনয়নীর কাছে, একটুও ভাল লাগছিল না এই বাড়ীর কোন কিছু, এমনি সময়ে একদিন বিকেলে বনবিহারী এলো। আর কিছুদিন এ ভাবে থাকলে মরে যেতে মৃগনয়নী। দিদির যাবার পর থেকে সমস্ত সংসারটার চেহারাই হয়ে উঠেছিল ফ্যাকাশে। জেলো! কথায় কারো জোর নেই। হাসিও ম্লান। এমন করে কি বাঁচা যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কাঁদাতে হোত খোকাকে। চিমটি কেটে। খোকার চীৎকারে তবু বোঝা যেত ও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আর সবাই। কখনও কখনও উঠে যেত ছেলে কোলে

নিয়ে আয়না মহলের ওপর। গোলবারান্দার ছাতে। সেখানে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগত আকাশের দিগন্ত। সীমানার বটগাছের পাশ দিয়ে মানুষের সারি। মনে হোত মানুষ আছে, আকাশ আছে, সবুজ আছে, পৃথিবী আছে। সন্ধ্যের সময় নেমে আসত একা একা। এসে আবার সেই ঘরে। নির্বাক, নিরুপায়, একা। পুঁটিদি থাকা না থাকা প্রায় সমান। ইদানীং আর কথাই বলত না বেশী।

যাও বা বলত আস্তে মরার মত মুখ নিয়ে। দিন দিন যেন রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছিল মৃগনয়নীর। এমনি সময়ে বনবিহারী এলো। সমস্ত বাড়ীটা একটু নড়েচড়ে উঠল যেন। কর্তামা বেরোলেন। বেরোলেন মা। খুড়োমশাই ভেতর বাড়ী এলেন খবর পেয়ে। হৃদয়দা তক্ষুণী ছুটল মাছের সন্ধানে। গয়লা বাড়ী খবর গেল। খুড়ীমা রান্নঘরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। পুঁটিদি ছুটে গেল বৌঠানের কাছে। বৌঠান হেসে গড়াগড়ি। একটু স্পন্দন। একটু জীবনের আভাস। বনবিহারী আসাটা যেমন আকস্মিক তেমনি আনন্দের। প্রণাম সেরে বনবিহারী চলে গেল বাইরের বাড়ীতে। পুরুষরা বাইরের বাড়ীতেই থাকে দিনের বেলা। রাত্রিতে ভেতরের বাড়ী। খুড়োমশাইয়ের কাছে কাছারী-তেই বসে।

— কি কচ্ছ আজকাল ?— খুড়োমশাই জিজ্ঞেস করেন।

— চাকরী করছি। পাটের অপিসে।—অফিসের নামটাও করতে হয়।

— তবে উপরীও কিছু আছে ?

— তা' আছে।

মৃগনয়নীর কাছ থেকে খবর পেয়েছিল কর্তাবাবু মারা গেছেন। তাই একটু বিমর্ষভাব হয়। কাছারীর পাশের ঘরটা ছেড়ে দেয় ওরা বনবিহারীকে সেখানে। কাপড় জামা ছেড়ে বসতেই হৃদয় আসে জলখাবার নিয়ে, হাত ধোবার জল নিয়ে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই আজও। তবু যেন মনে হয় জমজমাট ভাবটা কেটে গেছে। দিনটা কাটে। মৃগনয়নীকে আর দেখতে পায় না বনবিহারী। দেখা হয় রাত্রে। শুতে আসে অনেক রাত্রে। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর বসে। বাচ্চা ছেলেটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বোঝে ওরই ছেলে। ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে মন্দ লাগে না বনবিহারীর। ওর নিজের সন্তান। নিজের বোধচুকুতে কেমন একটু আনন্দ আছে। গালটা ওর একটু টিপে দেয়। মৃগনয়নীর মত শ্যামবর্ণ ছেলে। চোখের পাতাদুটি বেশ বড় বড়। বড় রোগা। বনবিহারীর মতই। বিছানায় বসে একটা বিঁড়ি ধরায় বনবিহারী। কিছুক্ষণ পরেই ঘরে আসে মৃগনয়নী। মুখটা নীচু করে। চুল বেঁধেছে মৃগনয়নী। বেশ আট করে। বৌঠান বেঁধে দিয়েছে। চোখে একটু কাজলের ছোঁয়া। ঠোঁটে একটু পানের রসের রাঙা ছোয়া, পায়ে টুকটুকে আলতা। লজ্জা করে মৃগনয়নীর। ছেলের মা এত সাজ কিসের! বৌঠান শোনেনি। বনবিহারী বিঁড়িটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী দোর বন্ধ করে আস্তে আস্তে বিছানায় এসে ছেলের কাছে বসে।

— শুয়ে পড়ো।

শোয় না মৃগনয়নী। অগত্যা বনবিহারী উঠে বসে, আর একটা বিঁড়ি ধরায়।

— চিঠির উত্তর দেবারও সময় ছিল না বুঝি ?

—না।— অম্লান মুখে উত্তর দেয় বনবিহারী।

— কেন ?

— কেন, গেলে বুঝবে। ভোরে বেরোই আর সন্ধেয় ফিরি। কিযে খাটুনী ধারণা করতে পারবে না।

— রাত্তিরেও কি সময় নেই।

— রাত্তিরে চোকের পাতাদুটো ব্যথায় ভার হয়ে আসে। ভীষণ দুর্বল লাগে। তাই—।

— তাই কি ?

— মানে বড্ড খাটুনী কিনা !

—তাই কি হয়েছে।

— তাই একজন বললে একটু করে ইয়ে খেলে বেশ জোর পাবে।

— কি খেলে ?

— ওই তোমার গে মদ আর কি ! মাঝে মাঝে একটু আধটু খেতে হয়।

মৃগনয়নী গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। এই ভেবে একটু সান্ত্বনা পায় যে কথাটা না জিজ্ঞেস করতেই বলে ফেলেছে বনবিহারী। এমন সরল ! তাই ত' এত ভয় একে নিয়ে। বনবিহারী তত-ক্ষণে বিঁড়িটা শেষ করেছে। একটা হাঁই তোলে। একবার বলে, —উঃ ! কি গরম ? মৃগনয়নীর দিক থেকে সাড়া আসে না। বনবিহারী বলে,— কাল বাদে পরশু গেলেই সব দেখতে পাবে। তোমায় পরশু নিয়ে যাব।

—পরশু ? — মৃগনয়নীকে যে এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে ও ভাবতে পারেনি।

—হ্যাঁ, পরশু। আমার মাত্র তিনদিন ছুটি। ছুটি বলে ত' কিছু নেই ! দুর্গা পুজোতেও বেরোতে হয়। একদিন ছুটি নেই।

— কি এত কাজ শুনি ?

বনবিহারী বিজ্ঞের মত হাসে — সে তুমি বুঝবে না। কাজের পাহাড়। এক একটা স্যালভেজ পড়লে আমাদের দিনরাত জ্ঞান থাকে না। আসতে রাত বারটাও হয়।

—সাল্‌ভেজ্‌ মানে ?

—সে আছে, বুঝবে না। পাটেরা গুদামে আগুন লেগে যায়। তাতে আমাদের কাজ বেড়ে যায়।

মৃগনয়নী তাকায় বনবিহারীর দিকে। সত্যি বোধহয় খুব খাটতে হয়। একটু মায়া লাগে ওর জন্যে। তেমন খাওয়াও বোধহয় হয় না।

—দুপুরে কোথায় খাও ?

—আপিসের মেসে। ওখানে খাওয়া ভাল।

—রাত্তিরে ?

—রাত্তিরে বাড়ীতে। আজকাল অনেক দিন খাইনা। নোতুন বৌঠান বড় ঝামেলা করছে। আবার চুপ থাকে মৃগননয়নী। ওর খাবার দিকটা নজর দিতে হবে। নইলে খাটবে কি করে ?

—ভাসুরঠাকুর কি একই আপিসে কাজ করে ?

—হ্যাঁ। দাদাও যেন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। গেলেই সব দেখতে পাবে।

আবার হাই তোলে বনবিহারী। মৃগনয়নী বোঝে বনবিহারী একটু বিশ্রাম চায়। নীরবে শুয়ে পড়ে। পরদিন বিকেলে খুড়োমশাইকে, রামতারণকে আর কর্তামাকে তিনজনকেই বলতে হয় যে কাল মৃগনয়নীকে ও নিয়ে যেতে চায়। আপত্তি কারো পক্ষেই হয় না। কর্তামা শুধু বলেন,—আর দুটো দিন জিরিয়ে গেলে পারতে।

—আমার ছুটি মাত্র তিনদিন।

কাজেই আর কেউ কিছু বলে না। খবর পেয়ে পুঁটির মুখটা শুকিয়ে যায়। এক গেলাস জল খেয়ে বলে,—হ্যারে, কাল নাকি চলে যাবি ?

—হ্যাঁ, কাল সকালে।

—কালই।—একটা ঢোক গেলে পুঁটি। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মৃগনয়নীরও মনটা ভার। যেটুকু আনন্দ হয়েছিল, সেটুকুও যেন উড়ে গেছে কোথায়। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই মনটা টন্‌টন্‌ করছে। টানে। এত দিনের এত মানুষের ভালবাসার টানে। শুধু কি মানুষ? প্রতিটি জিনিষ এমনকি ঘরগুলো পর্যন্ত টানছে। প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবার সময়ও এমন টান অনুভব করেনি মৃগনয়নী। তবু যেতে হবে। এদের ছেড়ে যেতে হবে। আজও যা দেখে গেল, এ সবও হয়ত দেখবে না আরও অনেক দিন পরে যদি আসে। কি থাকবে, আর কি থাকবে না, কে জানে।

—দিদির খবর জানাস ভাই পুঁটিদি।—গলা ধরে আসে মৃগনয়নীর।

পুঁটি হতাশ হয়ে বলে ফেলে,—একা একা কি করে থাকব?

মৃগনয়নী বলে,—তোর বরকে একটা চিঠি লেখনা?

পুঁটি শুধু বলে,—লিখেছিলাম।

মৃগনয়নীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—কই এতদিন বলিস্‌নিত'?

না। বলিনি।

পুঁটির হাত পায়ের তালু ঘামে,—কাউকে বলিনি।

—কেন পুঁটিদি?

পুঁটিদির ঠাণ্ডা হাতখানা ধরে মৃগনয়নী।

—উত্তরও পেয়েছিলাম।

—কি লিখেছে?

পুঁটি মৃগনয়নীর দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা নীচু করে ফেলে,—ওখানে আর কোন দিন আমার যাবার দরকার নেই।

—কেন?

—ও আবার বিয়ে করেছে? খুব সুখে আছে।

মৃগনয়নী পুঁটিদির ঠাণ্ডা হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে।

পুঁটির পাণ্ডুর ঠোঁটদুটো কাঁপছে,—সব দোষ আমার। ওর কোন দোষ নেই। আমি ত' ওকে সুখী করতে পারিনি।

—তবু—।—তবু যে কি সেটা আর বলতে পারে না মৃগনয়নী। যাবার আগে আর এক বেদনার বোঝা চাপিয়ে দিল পুঁটিদি।

আজ রাতটা কাটলে বাঁচে মৃগনয়নী। বাড়ীটা অভিশাপে ভরে গেছে। ও পালাতে চায়। এখুনী পালাতে চায় এ বাড়ী থেকে। শেষপর্যন্ত বিষাক্ত বিতৃষ্ণা নিয়েই যেতে হোল। মনের আকর্ষণের স্রোত উলটে গেল পুঁটিদির কথায়। শুধু হতাশা, শুধু বেদনা। এ বাড়ীর আনাচে কানাচে শুধু দীর্ঘশ্বাস। নিশ্চিত মনে হয় ওর, বহু দীর্ঘশ্বাসে, অনেক চোখের জলে এ প্রাসাদের জন্ম। এর শেষ অনিবার্য। আর দেরী নেই। গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে এ প্রাসাদ। এ বংশের ভবিষ্যৎ সন্তানদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বহুকাল। অন্যায়ের পর অন্যায়ের জমাট পাষাণ অত সহজে ক্ষয়ে যাবে না। এ অবধারিত সত্যকে স্পষ্ট চোখের সামনে রেখে বিদায় নেয় মৃগনয়নী। এত কৃষ্ণ মেঘের ভেতরে একটি মাত্র স্নিগ্ধশীতল নক্ষত্রের আলো ওর মনকে করুণা-ধারায় স্নান করিয়ে দেয়—সে রামতারণ। ওর বাবা। যাবার আগে বললে রামতারণ,—তোমার শান্তি হোক। সুখ আর শান্তি এক নয় মা। তুমি সুখের চেয়ে শান্তি পাবার চেষ্টা কোর। তা হলে ঠকতে আর হবে না।

—কেমন থাকেন জানাবেন বাবা।—মৃগনয়নী বাবার পাদুখানার ওপর মাথা রাখে

—আমি ভালই থাকব। তুমি চিঠি দিও।—

মৃগনয়নী ওঠে। রামতারণ জপে বসেন আবার।

আর কোনদিকে তাকায় না মৃগনয়নী। পাল্কীতে গিয়ে ওঠে। পাল্কীর দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে বন্ধ হয়ে যায় এখানকার সব কিছু। সব। কতকালের মত কে জানে। দুলতে দুলতে ওঠে পাল্কী। দুলতে দুলতে চলে। মন দোলে। তরঙ্গের পর তরঙ্গে। দিদির ম্লান মুখখানা। হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে থাকা। আম কাসুন্দি খাওয়াবি? কেউ আসে না আমার কাছে। কেউ না। পাল্কী দোলে। সব দোষই আমার। ওর কোন দোষ নেই। পুঁটিদি ঠাণ্ডা হাতের ঘাম স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আবার তরঙ্গ। আমার জন্যে একটু জপ করবি রাম। কর্তাবাবুর আতংকিত ভয়াবহ মুখ। কি ভয়াল দৃষ্টি! রামতারণ। বাবার মুখ। কি প্রশান্তি আর কি জ্যোতি! এইটুকুই আজীবনের পাথেয়। মৃগনয়নী মুখের ঘাম মোছে। নড়ে বসে। সহর কলকাতা। সহর কলকাতার মানুষ কেমন কে জানে। কেমন জায়গা? কেমন বাসা? কালো বৌ! কালো বৌয়ের চোখের সামনে আর দুটো চোখ। ঈর্ষায় ভ্রূকুটিতে চঞ্চল। নোতুন বৌয়ের চোখদুটো আসে কল্পনায়। নোতুন বৌ কি বলবে ওকে? ও তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে। ভাল বলেই নেবে। সংসারে কোন মানুষই খারাপ নয়। না। কেউ খারাপ নয়। লাভ লোক-সানের মাপ করতে গেলেই মানুষের বিকার আসে। সত্যি কি সে খারাপ? মৃগনয়নী আর এক-বার নড়ে বসে। মাথাটা হেলিয়ে দেয় পাল্কীর কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে। কেমন ঘুম-ঘুম পায়। অনেক ভ্রান্তির পর গভীর আরামের ঘুম। ছেলেটা ঘুম থেকে জেগেছে। কোলে শুয়ে তাকাচ্ছে। কি মিষ্টি চাউনী! ছেলের দিকে চোখ রেখে ঘোর ভাবটা কেটে যায়। ছেলেকে বুকে নিয়ে মন-স্থির করে বসে। কলকাতার প্রতীক্ষায়।

পনেরো

ঘুরে ফিরে এক জায়গাতেই আসা যায় না। জীবনটা বৃত্ত নয়, এ যেন একটানা স্রোত। কোথাও বা ঘূর্ণী, কোথাও বা তুফান। জীবনের ঘাটে ঘাটে দিনের পর দিন এগোতে হয়। এগোনই জীবনের লক্ষণ। এক হাটে বোঝা নাও, শূন্য করে দাও অন্য হাটে। আবার এগোয়। মৃগনয়নীর কাহিনী তাই ঘুরে ফিরে এক জায়গায় আসবে না। যে বোঝা নিয়ে ও আসছে কলকাতায়। তর-ঙ্গিনীর বেদনা, পুঁটিদির হতাশা, কর্তাবাবুর মৃত্যু। এ সব বোঝায় মন ভার। এ সব শূন্য করে দিয়ে নতুন বোঝায় মন ভরা। ঘাটে ঘাটে এই বেচাকেনা।

বারবার বলত মৃগনয়নী, কোথায় যে এর শেষ জানিনা! মরলেও কি শেষ নয়? বাবা বলত, মরলেও শেষ নেই, আমি ঠিকই থেকে যাব। কথাটা সত্য। এটাও সত্য যে যেখানে এর শেষ, সেখানে আমিটা আর থাকে না। ছোট আমিটা মিশে যায় এক বিরাট আমিতে।

কথাটা বারবার জানতে হয়, মৃগনয়নীও জানল। তাই ত' একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলে-ছিল,—কোথায় যে শেষ কে জানে? কি আছে পথের শেষে? এত বড় একটা জিজ্ঞাসাই করা যায় জীবনভোর। জীবনের পর জীবনে। উত্তরটাও যেখানে গেলে মেলে, সেখানে মৃগনয়নী কত জন্মে পৌঁছাবে জানিনে, কিন্তু এক ছিল কন্যা—তার নাম মৃগনয়নী, এই নামের জন্মে সে কোথায় গিয়ে কতটুকু পৌঁছোল, এর হদিশ পেয়েছিলাম আমি।

তাই ত' এই কাহিনী।

অনন্ত কালের হিসেবে এক বিন্দুতম জীবন। তবু আলোর স্ফুলিঙ্গ আলোই। আর কিছু নয়। দিনরাতের হিসেবে মাত্র সামান্য কতকগুলো বছরের এক টুকরো ভাব শুদ্ধি। তবু ভাব মহাভারতেরই অংশ। তাই মৃগনয়নীকে শ্রদ্ধা করি। ওর প্রতিটি মুহূর্তের ভাবকে শ্রদ্ধা করি। ভালবাসা নিয়েই বলছি তার কথা।

প্রথমে কলকাতার বিরাট প্রাসাদগুলোর ফাঁকে চার কোণা, তিনকোণা আকাশ ওর ভাল লাগেনি। মাঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে অনেক বড় আকাশ দেখা অভ্যাস। এখানে চোখ যেন ধাক্কা খায় দেয়ালে দেয়ালে। স্টেশন থেকে বাসায় যাবার পথে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শিয়ালদা থেকে এক ঘোড়ার গাড়ীর ওপরে মাল চাপিয়ে বসল ওরা ভেতরে। বনবিহারী ঘোড়ার গাড়ীতে বসে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নীর দিকে তাকালো। একটু গর্বের দৃষ্টি। ভাবটা, দ্যাখ, আমার জন্যে জীবনে কলকাতাও দেখতে পেলে। ভাল করে দেখে নাও। দেখবে কি মৃগনয়নী? যে দিকে তাকায় দেয়াল। একি বন্দীশালা? টুকরো আকাশ। রাস্তায় মাটি চোখে পড়ে না। এ কেমন দেশ? মৃগনয়নী কিছুটা অবাক হয়ে দেখতে থাকে।

—এই যে রাস্তাটা দেখছ, এই রাস্তায় আমাদের আপিসে যেতে হয়।

সোজা একটা রাস্তা চোখে পড়ে মৃগনয়নীর।

—এ জায়গাটা মাণিকতলা।

নামটি বেশ। মাণিক তলা। সোজা রাস্তাটা চিক চিক করছে হোস পাইপের জলে। গাড়ী চলেছে অনেক। মোটর গাড়ী। নাম শুনেছিল মৃগনয়নী। এবার দেখল।

মৃগনয়নী বনবিহারীর দিকে তাকায়।

—আপিস নেই কাল।

—না। পরশু। কালকের দিনটাও ছুটি আছে।

—তবে যে বললে!

—ওখানে থাকলে ত আর তোমাকে সহর দেখান যেত না?

বনবিহারী হাসে।

গাড়ী এসে গেছে শ্যামবাজারের কাছাকাছি।

—এই বাঁয়ে!—গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে হাঁকে বনবিহারী।

বাঁ হাতি একটা রাস্তায় ঘোরে গাড়ী।

খানিকটা এগোয় মন্থর গতিতে।

—রোখো।

গাড়ী থাকে। নেমে পড়ে বনবিহারী। গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্র নিয়ে একটা বাড়ীর ভেতর ঢোকে। একতলা একখানা বাড়ী গলির ভেতর। পাশের দোতলা বাড়ীটার তুলনায় বেশ পুরোনো। ইট বেরিয়ে গেছে স্থানে স্থানে। তবু বাড়ীটি ছোটর ওপরে বেশ ভালই লাগে মৃগনয়নীর। দোরের সামনে ছুটে এসেছে কালো বৌ। মৃগনয়নী পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায়।

দে' ভাই। ছেলে আমার কোলে দে।

ছেলেটিকে কোলে নেয় কালো বৌ—সরলা। মৃগনয়নী তাকায় ওর দিকে। রোগা হয়েছে আরও। মিশ্‌মিশে কালো রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়েছে। চোখদুটো হয়েছে আরও সাদা। ছোট মুখখানিতে চোখদুটো একটু অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে।

—কেমন আছো দিদি! একটা চিঠিও ত' দিতে পারতে।

—চিঠি!—কালোবৌ হাসে। হাসিটা যেন কান্নার চেয়েও করুণ। বলে,—চিঠি লিখতে কি জানি ভাই! আয় ভেতরে আয়। ওকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে সরলা।

সুন্দর ছোট একটু উঠোন। পরিষ্কার কিন্তু বড্ড ছোট। উঠোনের সামনেটা একটু দেয়াল-ঘেরা জায়গা।

—কলতলা। ওপাশে আবার একটা গঙ্গাজলের কলও আছে। সরলা দেখায়।

—মাত্র দুখানি ঘর। একটু ঘেরা বারান্দা।

বারান্দায় একখানা চৌকী পাতা। বড় দুটো থামের আড়াল থেকেও দেখা যায়। —কে শোয় ওখানে?—জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

বাড়ীর দাসী।

—আর এ ঘরে?

—তুই থাকবি।

আর ওঘরে?

—ওঘরে দেখবি চ'।

ঘরের সামনে এসে সরলা বলে,—অ, পদ্ম। দেখো কে এসেছে। মৃগনয়নী লক্ষ্য করে পানের বাটার কাছে বসে আছে একটি বউ। এই কি তবে নতুন বৌ? বৌটি বেরিয়ে এলো। চাঁপা ফুলের মত গায়ের রঙ। মুখখানি ডিমের মত। চোখদুটো একটু ছোট, একটু ফুলো ফুলো। তাকাল একবার। হাসল না। হাসি বোধহয় এ মুখে মানায় না। মুখখানার ভাব-টাই দেমাকে ভরা। মৃগনয়নী প্রণাম করে।

—থাক্। থাক।

সরলা ছেলেটাকে আদর করতে করতে হাসতে হাসতে বলে,—এই পদ্মবালা। আমাদের নতুন বৌ। কথাটায় একটু জ্বালা ছিল।

পদ্মবালা বলে,—থাক, পরিচয় আপনিই হবে। এই বুঝি ছেলে?

—হ্যাঁ।

পদ্মবালা একবার তাকায়। তারপর ঘরের ভেতর চলে যায়।

—কথা একটু কম বলে, নইলে এমনি খুব ভাল। বললে সরলা। খুব ভাল কথাটা বলবার সময় ওর স্বরটা একটু কাঁপে। মৃগনয়নীর কানে সেটা ধরা পড়ে। কথাটা যেন নিজের মনেমনেই বলে আবার,—খুব ভাল। মনটা ওর খুব ভাল। নিজেকে নিজে বলছে যেন। মৃগনয়নী উত্তর দেয় না ও কথার। বলে,—স্নান করব দিদি। জল কোথা দেখাবে চল। সরলা ওর সঙ্গে পুব-মুখো ঘরটায় আসে। ঘরের ভেতর জিনিষপত্র ছড়িয়ে একটা বিঁড়ি ধরিয়ে বসে আছে বনবিহারী। সরলাকে দেখে একটু নড়ে বসে। মৃগনয়নীও ঘরে ঢোকে। এই তার ঘর। তারা বাসা। ভালই লাগে ওর। তবে ঘরটা একটু যা অন্ধকার। পুবের দোর না খুলে রাখলে কিছু দেখা যাবে না। দুদিক একেবারে চাপা। গলির দিকটায় একটি মাত্র জানালা। এ দেয়ালের সঙ্গে ও দেয়ালের সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা। তার ওপরে ঝোলান একখানা গামছা নামায় সরলা।

ক্রমশঃ

শরভীতু

রাধারমণ প্রামাণিক

শরভীতু আমরাও বন্য হরিণের মতো। আমাদেরো তাই
প্রতিদিন শবরের চিন্তা থেকে সরে যেতে আর্ত আশঙ্কায়
এই গ্রাম নগরের পথ-ঘাট উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে হয়।
অথচ কোথায় যাবো। পৃথিবী এখনো শর-নিরপেক্ষ নয়
এই সব উপকূলে। এখনো দুচোখে অন্ধকার গাঢ়তর
হয় নিকো ভেবে নক্ষত্রেরা উপহাস করে। অনেক শূকর
বহু কীট পঙ্গপাল শস্যের সবুজে ঢুকে রোজ নষ্ট করে
ধানের শরীর বীজ। তবু সেই ধানক্ষেত বাঁচে না কী ঝড়ে

বাঁচে ঃ এই আশ্বাসের ইতিহাস আমাদের হৃদয়ের বলে
মুকুলিত হয়ে থাকে প্রান্তরের ঘাসে। আমাদেরি অশ্রুজলে
সুবর্ণ নদীর জল স্বচ্ছতর। হিজলের বন ডাকে তটে।
সৃষ্টির প্রথম রাঙা প্রভাতের নীল দুটি চোখের পলকে
দুটি চোখ জড়ো হয়। তখনি হয়তো জলে শবরেরা নড়ে ঃ
কী নির্ভয় চোখ তবু হরিণীর আলো আর প্রেমের ভিতরে।

কী কথা সে বলে যাবে

গৌরীশঙ্কর দে

আকাশের গন্ধবহ সন্ধ্যায় অস্পষ্ট কোনো মাঠ,
যাযাবরী জোনাকিরা মেলেছে আলোর স্নিগ্ধ ডানা,
নিভৃত স্রোতের পাশে বট যেন ছায়ার সম্রাট
কিংবা এই পৃথিবীর ভবঘুরে রাত্রির ঠিকানা।

এখানে নির্জন পথে আজ রাতে কোনো আগন্তুক
যদি একা চলে যায় শীর্ণ তার ছায়া ফেলে জলে,
মাটির আঘ্রানে উষ্ণ হয় যদি হিম তার বুক,
নীলিমার কানে কানে কি কথা সে যাবে তবে বলে!

সময় নেই

কোন লোক ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যাওয়াতে কণ্ডাক্টার বাঁধো বলে চেঁচিয়ে ওঠায় তিনি নাকি ধুলো ঝেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বুক ঠুকে বলেছিলেন, আমারে বাঁধে কেডা? রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে "আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে!" জ্ঞানীরা বলেন সময় নাকি অনাদি কাজেই অনন্ত। সময় কখন তাকে বাঁধা সোজা নয় বলে মানুষের কাছে আস্ফালন করেছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু মানুষ যে সময়কে বাঁধতে চেয়েছে তা আমরা ঘড়ি আবিষ্কৃত হওয়া দেখে অনুমান করতে পারি। বর্তমান জগতে সভ্যমানবের বেশভূষা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি তার হাতে একটি ঘড়ি না থাকে। সময়ের সঙ্গে সময়ানুবর্তিতার একটা সম্পর্ক আছে। সময়ানুবর্তিতা একটি গুণ যেটি যে মানুষের বা জাতির আয়ত্ত করা হয়ে গেছে সে মানুষ বা জাতি কৃতি। মাইকেল মধুসূদন মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাধনা ছিল ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখা। কিন্তু আমাদের সাধারণ ধারণা গায়ের চামড়া ফরসা হ'লে, ইংরেজী জানলে এবং ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জীবনকে বেঁধে ফেলতে পারলে সাহেব হওয়া যায়। আমি দেখলাম গায়ের রঙ এত পাকা যে তাকে হাজার মাজা ঘসা করলেও ইতর বিশেষ করা যায় না; ইংরেজী ভাষাটা জিভের সঙ্গে প্রতি পদে অসহযোগিতা ক'রে সাহেব হবার প্রতিবন্ধকতা করে তার চেয়ে বরং সময়ানুবর্তিতা আয়ত্ত করা সহজ। আরও একটা কারণ—ছোটবেলা থেকেই শুনতাম বাঙালীর সময় ত ছটা মানেই সাতটা; কথাটা একেবারে শুনতে ভাল লাগত না।

সময়ানুবর্তি হতে সব সময় হাতে ঘড়ি থাকা আমি প্রয়োজনীয় মনে করি না। আমার কব্জি জীর্ণ বা ঘড়িটা কমদামী বলে যে আমি খুব কম ঘড়ি ব্যবহার করি তাও নয়। ঘড়ির ব্যবহার হওয়া উচিত কাজ মাপা যন্ত্র হিসেবে। তা না হলে শুধু সময়মাপা যন্ত্র হওয়ায় ওর কোন গৌরব নেই। অবসরের সময়কে ঘড়ির কাঁটায় কণ্টকিত করার আমি পক্ষপাতী নয়। অবসর বিনোদনের সময় আমার হাতে কখন ঘড়ি থাকবে না। আট ঘণ্টায় যদি আমি দুটো কি তিনটে কি চারটে কাজ করি ত এক একটা কাজের জন্যে সম্ভাব্য সময় ভাগ করে নেব; তখন সেই সময়টা উত্তীর্ণ হল কি না দেখার জন্যে ঘড়ির প্রয়োজন। কিন্তু যদি আট ঘণ্টা ঘুমবার ব্যবস্থা করি তখন আর ঘড়ি আমার স্বর্গে কি বাতিটা দেবে! আমাতে এবং পণ্ডিতজীতে যে তফাৎ তা হল সময় পাওয়ার। আমি তিন চার বছর চেষ্টা করে একবার দীঘা গিয়ে উঠতে পারলামনা আর পণ্ডিতজী বছরে তিনচার বার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবী ঘুরে এলেন। খুব বেশী কাজ যাঁরা করেন তাঁরা সব কাজেরই ঠিক সময় পান। আমাদের কাজও নেই অবসরও নেই। অথবা ওঁদের অবসরটাও একটা কাজ। আমি ছবি দেখতে যাই, নাটক দেখতে যাই, নাচগান শুনতে যাই (টিকিট কেটে); ওঁরা কোনটা উদ্বোধন করতে যান, কোনটায় সভাপতিত্ব করতে যান, কোনটার বা প্রধান অতিথি হিসেবে যান (টিকিট কাটতে হয় না)। প্রধানমন্ত্রী শুনেছি রাতে তিন ঘণ্টা ঘুমোন; গান্ধীজিও ঘণ্টা আড়াই নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। আমায় আটঘণ্টা ঘুমোবার পর ডেকে তুলতে হয়।

এলিয়ট রোড দিয়ে নোনাপুকুর যাবার দিকে রাস্তার বাঁ ধারে একটা দোকান পড়ে। দোকানী কেমন দেখতে তা কখন চেয়ে দেখিনি। পশরা কি থাকে তাও তেমন লক্ষ্য করিনি। বোধহয় মুখ্যত মুদীখানার দোকান। তার হলদেটে দেওয়ালে চোখ পড়লে দেখা যায় একটি ছবি—হয় ত কোন হিন্দি চিত্রাভিনেত্রীর, আর একটা দেওয়াল ঘড়ি। সাধারণ ঘড়ি যেমন হয়ে থাকে তেমনি তবে সাধারণত ওটা চলে না। ও পথে যেতে যেতে যখনি চোখ পড়েছে দেখেছি ঐ চিত্তহারকা কোন উদ্ভিজ্জ তেলের গুনগানে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে রয়েছে এবং অচল অবস্থায় ঐ ঘড়িটি তাঁর পাশে শোভা পাচ্ছে। দোকানীর কখন ঘড়িটা চালাবার জন্যে শিরঃপীড়া ঘটে একথা আমার মনে হয় না। অথবা বহুচেষ্টায় শেধরাতে না পেরে বয়ে যাওয়া ছেলের মত ওকে খোদার নামে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাও ঘড়িটা ওখানে থাকার কারণ, আমার মনে হয়, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল কথাটি দোকানীর জানা নেই; কিংবা সে ভাবে দোকানে একটা দাঁড়িপাল্লাই যথেষ্ট নয় অভিজাত অঙ্গসজ্জার জন্যে একটা ঘড়ি না থাকলে বেমানান দেখায়। কুমারদের লক্ষ্য ভেদের পরীক্ষায় দ্রোণ অর্জুনকে জিগেস করলেন, বৎস কি দেখছ? অর্জুন উত্তর দিলেন, পাখীর চোখটি আর কিছু নয়। মুদীখানার দোকানে কেউ কিছু কিনতে গেলে ক্রেতার কর্তব্য পশরার দিকে লক্ষ্য রাখা, দাঁড়ি পাল্লার কাঁটা তার দিকে (দোকানীর দিকে না হলে) হেলছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অর্জুনের মত একাগ্রলক্ষ্য সকলে নয়। তারা অন্যত্র দৃষ্টিপাত করতে পারে। তা যদি করে তবে পাশাপাশি অচল ঘড়ি এবং চিত্রাভিনেত্রীর মধ্যে যেটি কম অচল সেদিকেই লক্ষ্য করবে। পথচারী কোন মূঢ় যে ঐ ঘড়িটা নিয়মিত লক্ষ্য করে এক প্রবন্ধ ফাঁদবে এ কথা দোকানী স্বপ্নেও ভাবে নি। আমি জানি যদি আমার সঙ্গে দোকানীর এ নিয়ে কোন কথা হত তা হলে সে গম্ভীরভাবে জি পি-ওর ঘড়ি শেয়ালদা স্টেশনের ঘড়িগুলো নিয়ে যেতে চাইত।

কলকাতায় অনেক বড় বাড়ী আছে, অনেক বড়লোকের বাড়ী আছে। অনেক বাড়ীর নাম আছে — অমুক মঞ্জিল, অমুক হাউস, তমুক ভবন। সে সব নামে বাড়ীর অধিবাসীদের কোন পুরাতন আভিজাতের গন্ধ থাকে। বিবিপুর হাউস বললেই চোখ বড় বড় করে বুঝতে হবে এ'রাই সেই বিবিপুরের নবাব। বিবিপুর কেন বিখ্যাত তার বংশধরেরাই বা নবাব কিসে এসব ভেবে ঘুম পেলে চলবে না। নামওলা বাড়ীর নামের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণের অজ্ঞাত। অথবা স্বনামধন্যতার আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তাও বর্তমান বংশধরেরা বাড়ীর গায়ে পাথরের ফলকে কিংবা চিঠি লেখার কাগজের মাথায় তাঁরা যে একটা কিছু ছিলেন এ বোঝবার প্রয়াস আছে। এলিয়ট রোডের দোকানীর ঘড়িও ত একদিন চলত; এখন বন্ধ ঘড়ি টাঙ্গিয়ে রেখে ও একা আর কি দোষ করেছে। নামওলা বাড়ীর মত ঘড়িওলা বাড়ী আছে কলকাতায় অনেক। বাড়ীর গায় বা চূড়োয় বড় ঘড়ি লাগান থাকে। আমার মনে হয় এর উদ্দেশ্য পরোপকার। কারণ প্রতি কাজে ঐ সব বাড়ীর বাসিন্দাদের বাইরে বেড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে সময় দেখতে গেলে কাজ চলে না সময় নষ্ট হয়। কাজেই নিজের প্রয়োজনে ওসব ঘড়ি নয় বাইরের লোকেদের জন্যে, পথচারীদের জন্যে, আশে পাশে বহু ঘড়ি নেই বলে মরমে মরে থাকা প্রতিবেশীদের জন্যে।। এতে কোন গোল নেই কিন্তু মানুষের মাথার চেয়েও যা ব্যাপকতর ভাবে বিগড়োয় তা হল ঘড়ি। বেগড়ান ছোট ঘড়ি যত সহজে আস্তিনের নিচে গোপন করা চলে গম্বুজের বড় ঘড়ি তত সহজে চোখের আড়াল করা যায় না। ও সব ঘড়ির আকার এবং প্রকার এমন যে বহু ব্যক্তি প্রথম চক্ষু পরীক্ষকের শরণাপন্ন হল ঐ সব ঘড়িতে সময় দেখতে না পেয়ে। ঐ সব ঘড়ি

অচল হলে সব লোককে চক্ষু পরীক্ষকের কাছে পাঠান চলে না। তখন কাঁচে কাগজ সেঁটে, রাত্রে ঘড়ির আলো নিভিয়ে শতচক্ষুর আড়াল করতে হয়। যখন কয়েকদিন ধরে কলকাতার বড় ডাকঘরের বড় ঘড়ি সকালেও এগারটা কুড়ি বিকেলেও এগারটা কুড়ি দেখিয়ে এক কথার ভদ্রলোক সেজেছিল তখন ডাকঘরের কর্তৃপক্ষ কাগজে বিবৃতি দিলেন ঘড়ির মাথা খারাপ হয়েছে। ভদ্রলোককে মাথা খারাপ বলে আমরা অনেকসময় প্রতিপক্ষকে তর্কে নিবৃত্ত করতে চাই। হিন্দি ভাষার সমর্থকরা এখন যেমন রাজাজীকে বলছেন।

সম্প্রতি কলকাতায় হো চি মিন এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যা জানা গেল তার মধ্যে আমার যা সবচেয়ে ভাল লেগেছে তা হল ওঁর সহজ ও সরল ভাব এবং সময়ানুবর্তিতা। তাঁর সময়ানুবর্তিতা নাকি প্রবাদবাক্যের আকার নিয়েছে। জর্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধেও একটা গল্প শুনেছিলাম। তাঁরও নাকি প্রবাদবাক্যের মত সময়ানুবর্তিতা ছিল। একবার কোথাও একমিনিট (আধমিনিট-ও হতে পারে) দেরী হয়েছে দেখে তাঁর একান্ত সচিব বলেছিলেন, মশাই সর্বনাশ হয়েছে আপনি এক মিনিট দেরীতে এসেছেন। ওয়াশিংটন নাকি উত্তরে বলেছিলেন, আইদার ইউ চেঞ্জ ইয়োর ওঅচ অর আই শ্যাল চেঞ্জ মাই সেক্রেটরী। তুমি ঘড়ি না পালটালে আমি একান্ত সচিব বদলাব। এতে দেখা যাচ্ছে জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর একান্ত সচিবের চেয়ে, একান্ত সচিবের ঘড়ির চেয়ে হয়ত নিজের চেয়ে নিজের ঘড়িকেই ধ্রুব মনে করতেন। নিজের ঘড়িকে ঠিক মনে করা এক মারাত্মক পাগলামি। একান্ত সচিব জানেন তাঁর নিজের ঘড়ি ঠিক সেজন্য রাষ্ট্রপতিকে দেরীর কথা বলেছেন; রাষ্ট্রপতি জানেন তাঁর ঘড়ির চেয়ে তাঁর একান্ত সচিব কম বিশ্বাসী নয়, কম প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু তার চেয়েও বেশী জানেন নিজের ঘড়িকেই ঠিক বলে।

যাঁরা খুব রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে গুটি তিন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটা হল তাঁর বিশ্বনাগরিকতা। এটি থাকায় তিনি কোন পাথর না উলটে ছাড়েন নি। সেইজন্যে জীবনের সব ক্ষেত্রেই হাতড়ালে রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু না কিছু উদ্ধৃতি হাতের কাছে মেলে। আমার বেশী পড়া নেই। রবীন্দ্রনাথে থৈ না পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণার্থী হয়ে একটা তল পেলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উপমা দিয়েছিলেন, সকলেই মনে করে তার কথাটাই ঠিক যেমন সবাই ভাবে তার ঘড়িটাই ঠিক চলছে। এটা যে কতবড় কথা তার প্রমাণ শুধু ওয়াশিংটনের একান্ত সচিব বা স্বয়ং ওয়াশিংটন নন; সময়ানুবর্তিতার ধারে কাছে যায় না এমন বহু বহু ঘড়ি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। পাঠক ইচ্ছে করলে স্বয়ং পরীক্ষা করবেন। যে কোন লোককে প্রথমে জিগেস করুন কটা বেজেছে। তার পর শুধোন ঘড়ি ঠিক আছে? হয় উত্তর দেবে রেডিওর সঙ্গে মেলান, নয় বলবে ছমাস ধরে মেলাবার চেষ্টা করছি আধ মিনিট কম-বেশী হয়ে মেলাবার যে সুযোগ পাব তা পাচ্ছি না, আর নয় এমন ভাবে তাকাবে যেন আপনি অস্পৃশ্য হয়ে ব্রাহ্মণবিধবার আতপ চালের ভাতের হাঁড়িটি ছুঁয়ে দিয়েছেন।

না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না— যে কবি লিখেছিলেন তিনি জীবিত থাকলে ভারত ললনারা যে জেগেছেন তা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুঝতে পারতেন। সাড়ে ছটায় কোন জায়গায় যাবার কথা। পুরুষরা তৈরী হয়েছেন। মহিলারা সাজ-পোষাক করে যখন নেমে এলেন অনেকটা দেরী হয়েছে। ফুটপাত থেকে একজন মহিলা বাড়ীর মধ্যে ফিরে যাবেন। আরও কিছুক্ষণ বাদে অপেক্ষমান সহগামীদের কাছে বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে কাউকে বলবেন, চট করে ঘড়িটা বেঁধে দাও দেখি—ফেলে এসেছিলাম। তখন ঘড়িতে সাড়ে আট। ভারত ললনারা আর ঘুমিয়ে নেই যুগের সঙ্গে (নজরুলের সব ভাল কিন্তু যুগের সঙ্গে হুজুগ ছাড়া আর মেলাবার কিছু পেলেন না) পা মিলিয়ে চলেছেন। তাঁরা জেগে-

ছেন, ঘড়ি পড়েছেন। বাঁ হাতে একটা লাল সুতো বাঁধা ছিল রামনাথ পন্ডীর।

স্নানের ঘাটে কটি মেয়ে তাই দেখে ঠাট্টা করলে। হাতে একটা লাল সুতো বাঁধা তার দেমাক দেখ, আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। তিনি উত্তর দিলেন, এই লাল সুতো বাঁধা আছে বলে এখনও নবদ্বীপের মান আছে। (আর একটু পরিস্কার করে বলি; নইলে কেউ যদি মনে করেন নবদ্বীপ সে সময় টেক্সটাইল ইনডাস্ট্রিতে খুব উন্নতি করেছিল তবে আমার দোষ) রামনাথ মানে বুনো রামনাথ মানে পাণ্ডিত প্রবর রামনাথ বড়ই দরিদ্র ছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু স্ত্রীরা য়োতির চিহ্ন স্বরূপ বাঁ হাতে লাল শাঁখা পড়তেন। রামনাথ পত্নী শাঁখার অভাবে লাল সুতো বেঁধেছিলেন। ঐ লাল সুতো পণ্ডিত রামনাথের জীবিতাবস্থার প্রমাণ। শুধুমাত্র তাইতেই নবদ্বীপের মান, বাঙলা দেশের নাম। এখানকার স্ত্রীর হাতে একটা ঘড়ি না থাকলে স্বামীর বদনাম।

রবীন্দ্রনাথের কোন একটা কবিতায় নাকি এক কবি তার স্ত্রীকে বীরত্ব করে বলেছে, প্রাণ দিতে পারি শুধু জাগে ভয় বিধবা হইবে পাছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলাল যখন তখন দেশের জন্যে প্রাণ দিতে যেত, কিন্তু দিতে পারত না নন্দলাল মরলে অভাগা দেশের কি হবে ভেবে। আমাদের সব ওই রকম অবস্থা; দেশের ও দশের জন্যে কিছু করতে পারা মানুষের মত কাজ কিন্তু করব কখন। শুচিবায়ুগ্রস্তা বৃদ্ধা বা পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধের মত সোনার ঘড়ি টিক টিক করে চলেছে। বলছে নদীর স্রোতের মত সময় বয়ে যায়, কাজ করবে কখন? বাস্তবিক কত অসুবিধে; কাজ করি কখন! সময় নেই। হাতে আমাদের ঘড়ি আছে বটে হাতে আমাদের সময় নেই।

শংকর গুপ্ত

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

সংস্কৃতি শব্দটি নিয়ে আজ আবার নতুন করে অনেক বাদানুবাদ সুরু হয়েছে। 'সংস্কৃতি' বা কৃষ্টি শব্দটি আমরা ইংরেজী 'কালচার' কথা থেকে এনেছি এ কথা সত্য। কিন্তু কালচার কথার অর্থ অনুসারে আমরা যদি 'সংস্কৃতি'র অর্থ কর্ষণ বা ওই জাতীয় কিছু করি, তা হলে আমরা সংস্কৃতির অর্থকে সঙ্কীর্ণ করে আনবো। শব্দ ও ভাষার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শিথিল ছিলেন না। আর তিনি নিজেই "কৃষ্টি" কথাটা বদ্‌লে যখন "সংস্কৃতি" ব্যবহার করেছেন, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি কালচার কথাটা কর্ষণ অর্থে ব্যাবহার করতে চাননি। আসলে কর্ষণ বা চেষ্টা বা সাধনার দ্বারাই একটি জাতি বা মন সংস্কৃতিমান হতে পারে কিনা সে বিষয়েও কবির সন্দেহ ছিল। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তা পারেনা। আমরা বলবো যে কর্ষণ নয়, সাধনাও নয়, যদি সাধনার ধারার মধ্যে একটি জাতির বা মনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও রুচিশীলতার স্ফুরণ ঘটে, যা তার সমসাময়িক বা ভবিষ্যৎ রুচিকে প্রভাবিত করে তবে সেই বৈশিষ্ট্যের ধারাকেই বলবো সংস্কৃতি।

আসলে ইংরেজী কালচার (Culture) শব্দ তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এই কালচার শব্দ এসেছে জর্মান কুলটুর শব্দ থেকে। কুলটুর কথার দ্বারা জার্মানরা যা বোঝায় কালচার কথা দিয়ে ইংরাজেরা ও 'সংস্কৃতি' দিয়ে আমরা তাই বোঝাতে চাই। আর কুলটুর কথার অর্থ হচ্ছে প্রতিবেশের ওপর প্রভুত্ব করা।

সংস্কৃতি বা কালচার শব্দ সেই জাতির বা মনের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে যে জাতি বা মন জীবন্ত। অর্থাৎ যার প্রগতি বা প্রগমন আছে। উলটে বলা চলতে পারে যে পৃথিবীতে সেই জাতি বা সেই মনই বেঁচে থাকতে পারে, যার মধ্যে সংস্কৃতির ধারা আছে। সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল নিশ্চয়ই। কিন্তু সংস্কৃতি কখনও একান্ত ঐতিহ্যপরায়ন হতে পারেনা। কারণ যে নদীর স্রোত থাকে সে কখনও বালুচড়ায় আটকে থাকে না। স্রোতের ধর্মই হচ্ছে এগিয়ে চলা। একযুগের যে বৈশিষ্ট্য ও সাধনা মানুষকে তার জীবনের পথে এগিয়ে দেয় পরবর্তী যুগে বিভিন্ন পরিবেশে সেই ধারাই তার পথকে সংকীর্ণ করে আনে।

জীবনকে যদি নিত্য পরিবর্তনশীল বিকাশের ধারা বলে মেনে নেওয়া যায় তবে ঐতিহ্য সংযোগরক্ষাকারী সূত্র মাত্র।

নদীর বিকাশ ঘটে তার স্রোতের প্রবলতায়। একটা জাতির চিত্ত স্ফুরিত হয় তার চলার প্রেরণায়। এই চলার রূপটি সম্যকরূপে কৃত হয় অর্থাৎ যদি এই চলার মধ্যে মনের রুচির দীপ্তি স্থায়ী হয়ে জ্বলতে থাকে,—তবেই সে চলার ধারাকে আমরা বলবো সংস্কৃতি।

তবে এই সংস্কৃতির সম্যকপরিচয় কিভাবে মিলবে? কি দিয়ে আমরা বিচার করবো জাতির সংস্কৃতির রূপকে?

মানুষ তার অদম্য প্রাণশক্তির প্রেরণায় সহজ জৈবজীবনকে ছাড়িয়ে মনের সূক্ষ্মতর অনুভূতির পথ অনুসরণ করে চলতে চায়। এই অনুভূতি দিয়েই একদিন সে খুঁজে পায় তার বিস্ময়বোধকে তখন সে চেয়ে দেখে কী উজ্জ্বল এই সূর্য্য কী অনন্ত এই নীল আকাশ। তখন সে প্রশ্ন করে—কেনেষিতং? কে সৃষ্টি করেছে সমুদ্রমেখলা সূর্য্যবিভূষিতা এই অপরূপা পৃথিবীকে?

সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়ের এই অনুভূতি থেকেই জন্ম নেয় সঙ্গীত, নৃত্য সাহিত্য, চিত্রকলা ও দর্শন। এই সঙ্গীত সাহিত্য যদি সমাজের উচ্চস্তরেই আটকে থাকে, তবে আমরা বুঝবো যে সংস্কৃতির ধারা কিছুসংখ্যক অভিজাত শ্রেণীকে আশ্রয় করে আছে। কিন্তু আমাদের দেশে পল্লী-সঙ্গীত, কবির গান, বাউল, তরজা, লোকনৃত্য ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় যে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাপক। অবশ্যই আমরা নিছক নৃত্যের চর্চা বা ছবি আঁকার ইস্কুলকে সংস্কৃতির কেন্দ্র বলবোনা। কলকাতার পথে ঘাটে যদি আজ সঙ্গীত শিক্ষার আখড়া বসে, তবে তাকেও বলবোনা। কারণ সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস যার সঙ্গে রয়েছে প্রাণের যোগ। আর এই প্রাণশক্তির জোরেই এ প্রতিবেশকে প্রভাবিত করে।

সবশেষে, সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন একটা স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে চলেছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। বাঙালীর দেহে মিশ্ররক্ত। বাংলাদেশে নদীর প্রাচুর্য্য। একদিকে পলিমাটির কোমলতা আর একদিকে কীর্তিনাশার রুদ্র ভৈরব ব্যাঞ্জনা তার হৃদয়ে। তাই বাঙ্গালীমন চিরকাল আপন প্রাণের ধর্ম্মকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলার কথা ভাবতে পেরেছে। তাই বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। বৈষ্ণব আন্দোলন, সহজিয়া ও বাউলসম্প্রদায়ের অভিনব জীবন ব্যাখ্যা জীবনে স্থান পেয়েছে। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক মনের বিপর্যয় ঘটবেনা, কারণ চলমান জীবন স্রোতে সে আজও নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পেরেছে। যদি সাময়িকভাবে সে স্রোতের মুখে বালি জমে বন্ধবীপের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বর্ষার আবির্ভাবের কাল পর্য্যন্ত। মহত্তর সৃষ্টির জন্যেই প্রয়োজন নিঃশব্দ প্রস্তুতির।

সন্তোষকুমার অধিকারী

উচ্ছৃংখলতা প্রসঙ্গে

ছাত্র ও যুবসমাজে উচ্ছৃংখলতা আজ সার্বজনীন আলোচ্য বিষয়। পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডামী, দাঙ্গাবাজি, জোরজুলুম প্রভৃতিতে ভদ্রবংশীয় তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কয়েক বছর ধরেই কলকাতার সমাজজীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। কিছুদিন আগে 'উঠতি গুণ্ডাদের' বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান এশ্রেণীর ঘটনার ব্যাপকতা হ্রাসে নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। কিন্তু ফল যে স্থায়ী হয়নি, তা সাম্প্রতিককালে অনুরূপ উৎপাত বৃদ্ধি এবং বিশেষতঃ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা-কেন্দ্রে হানা ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংঘর্ষ, শতকরা একশজনকে পাশ করানোর দাবীতে শিক্ষক-গণের উপর আক্রমণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্ব-প্রকট। মূলতঃ পুলিশী কঠোরতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েও এ সত্য অবশ্য উল্লেখ্য যে রোগ আজ সমাজজীবন ও যুবমনঃস্তত্ত্বের গোড়ায় এমন ভাবে শেকড় গেড়েছে যা পুলিশী তৎপরতার বাহ্যপ্রয়োগে নিরাময়যোগ্য নয় — এজন্য বাহ্যপ্রযুক্ত মলমের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ মূলস্পর্শী ওষুধও অত্যাবশ্যক। কিন্তু এহেন চিকিৎসাপদ্ধতি মূলতঃ রোগের কারণনির্ণয়ের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেজন্যই আমা-দের এদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রে এনিয়ে আলোচনাও কিছু হয়েছে। তাঁরা দাঙ্গা ও দেশবিভাগ-জনিত অপরাধপ্রবণতার বৃদ্ধি, সমাজজীবনে সামগ্রিক হতাশা, ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা প্রভৃতি কারণকে এজন্য দায়ী করেছেন। এছাড়া অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির পেছনে রাজনৈতিক দলগুলির পরোক্ষ প্রশ্রয় ও সমর্থনের কথাও আলোচিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর প্রত্যেকটি কারণ গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু এরা ছাড়া আরও কতগুলি কারণ আছে, যা এখনও যথোপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

উল্লিখিত কারণগুলি যে কোন সমাজদেহকে রোগজীর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু আমাদের মতে যে মৌল কারণে আমাদের সমাজে অশুভপ্রভাবপ্রতিরোধশক্তি আজ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত ও ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য পর্য্যায়ে উপস্থিত, তা হচ্ছে মহৎ সামাজিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার মত নেতৃত্বের অভাব। যুদ্ধ, বেকার সমস্যা প্রভৃতি কারণ সমাজ-কাঠামোকে বিধ্বস্ত করে দিলেও, আদর্শবাদের সঞ্জীবনী প্রভাব যদি কোন দেশের যুবমনে সক্রিয় থাকে, তবে সমস্যা এত বিকট হয়ে ওঠে না। বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ব্রিটিশ অর্থনীতি ও সমাজজীবনও কম বিপর্যস্ত হয়নি, —কিন্তু সেখানে যে আজও এদেশের মত কিম্বা প্রথম যুদ্ধোত্তর জার্মানীর মত অবস্থা হয় নি, তার কারণ ব্রিটিশ সমাজে কতগুলি মূল্যবোধ আজও অটুট, এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন সেদেশের যুবমনকে আজও আলোড়িত করে। ভারতবর্ষেও পরাধীনতার যুগে জাতীয় মুক্তির আদর্শ ও স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব যতদিন জাতির সামনে ভাস্বর ছিল, কোন দুর্বিপাকই ততদিন জাতীয়-জীবনের ক্লেদকে এমন অপরিমেয় করে তুলতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে আজকের এই উচ্ছৃংখলতা সমাজ-বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে সামাজিক পশ্চাদ-গামীতা বা Social regression বলা হয়, তাই। মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর শিল্প

বিপ্লবের প্রয়াস এদেশেও ধনতন্ত্রী মূল্যবোধের প্রসার ঘটিয়েছে। ফলে সম্পদের অধিকারই সামাজিক মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠমানদণ্ড বলে সমাজেও স্বীকৃত। অথচ আমাদের শিল্পায়ন প্রয়াসের বিশেষ চরিত্রের জন্য মুদ্রাস্ফীতির ক্রমবর্দ্ধমান চাপ এবং উদীয়মান শিল্পপতি গোষ্ঠীর স্বীয়-স্বার্থসংরক্ষণ নৈপুণ্য তথা জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষে বিঘোষিত সামাজিক নীতির মর্য্যাদারক্ষায় ব্যর্থতা গত দশ বছরে ধনীকে সম্পন্নতর অথচ সাধারণকে নিঃস্বতর করেছে। এর ফলস্বরূপ বিক্ষোভ ও হতাশা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিক্ষোভ ও হতাশামাত্রেই পশ্চাদগামী নয়— তা সৃজন-ধর্মী তথা প্রগতিশীল কর্মেও নিযুক্ত হতে পারে। বিশ্বের সর্বত্রই যে কোন বিপ্লবের সাফল্যের মূলে রয়েছে সমাজমানসে দানাবাধা হতাশা ও বিক্ষোভকে সামাজিক গতির কাজে লাগাবার সার্থক প্রয়াস। ভারতে যে তা সম্ভব হয় নি —তা আমাদের সর্ববিধ নেতৃত্বের ব্যর্থতাই প্রকট করে।

অথচ পেশ করার মত আদর্শের অভাব হয় নি। সমাজবাদ আজ জনমনে পরমশ্রদ্ধেয়। সমাজ-হিতের সচেতন সংজ্ঞাবারা জাতীয় অর্থনীতি তথা সমগ্র সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে— দেশে অনাকাঙ্খিত বৈষম্য থাকবে না, জীবনের ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রত্যেকের অবশ্য প্রাপ্য হবে, সামাজিক আদর্শ হিসাবে এই চিন্তাধারা প্রায় সব রাজনৈতিক দলই যে গ্রহণ করেছেন, তাই আদর্শ হিসাবে সমাজবাদের অনস্বীকার্য্য আকর্ষণ তথা উপযোগিতা প্রমাণ করে। বহুযুগের স্থানুত্বের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবাহে প্রাগসরমান বেগ সঞ্চারের আহ্বান নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল সে আহ্বানেও জনমনে আলোড়ন তুলতে পারলেন না। কোন বামপন্থী দলও আজ পর্যন্ত সেই আদর্শের বিশ্বস্ত প্রতীক বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

অথচ উপযুক্ত কণ্ঠের মহৎ আহ্বান যে যে কোন তামসশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ ১৯৪৭-এর কলকাতার বুকে দেখা গিয়েছিল। হতাশা, অবিশ্বাস, লোভ, ভয় আর প্রতিক্রিয়ার শক্তি যখন পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে, সেদিন একটি ক্ষীণ দুর্বল মানুষের আহ্বানে রক্তস্নাত মহানগরীর পর্যুদস্ত শুভবুদ্ধি মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কলকাতার রাজপথে সেদিনের শান্তিসংগ্রামের অবিশ্বাস্য সাফল্য যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই বলবেন যে বিষম্ব পারিপার্শ্বিক ও পর্বতপ্রমাণ বাধাকেও জয় করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্য চাই অপরিমেয় বিশ্বাস ও আদর্শবোধে উদ্দীপিত সৎ নেতৃত্ব। চাই সেই নিষ্কলঙ্ক নায়কত্ব—যার মধ্যে হতাশ যুবমন পাবে নতুন আশ্বাসের প্রতীক। কিন্তু তা আজ দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী কোনদলেই নেই। এবং নেই বলেই এদেশের যুবশক্তির এক বৃহৎ অংশের কাছে আদর্শ-বাদের আহ্বান সম্পূর্ণ অর্থহীন। বর্ত্তমান যাদের অন্ধকার — ভবিষ্যতের আলোও যাদের চোখে পড়ে না, প্রতিক্রিয়ার আদিম হিংস্রতা যে তাদের মধ্য দিয়েই জাতীয় জীবনের বুনিয়াদে নির্ম্মম আঘাত হানবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বিশ্বসভার স্বার্থান্ধ হাততালিতে যাদের কান বধির, চোখ ধাঁধান পরিকল্পনার ফাইল নিদর্শিত সাফল্যে যারা বাহ্যজ্ঞানরহিত, তারা কীর্ত্তিনাশার এই ভাঙ্গন সম্বন্ধে সজাগ কবে হবেন?

সুব্রতেশ ঘোষ

স মা লো চ না

পুরাতনী। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ৫ টাকা।

যে শতাব্দী আমরা পার হয়ে এসেছি তার যথার্থ দীপ্তি আমাদের চোখে তখন ধরা পড়েনি। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা তথা ভারতবর্ষের জীবনে বহু বিচিত্র পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। যত দূরে সরে চলেছি আমরা ততই যেন সেই শতাব্দীর গুরুত্ব নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের আসরে সেই সময়কার স্মৃতিকথা, ইতিহাস প্রভৃতি রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে অনেক। 'পুরাতনী, সেই জাতেরই গ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথঠাকুর এবং তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিচয় বাংলাদেশে খুব অল্প নয়। প্রথম আই, সি এস হিসেবেই সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত। রাজকীয় পদমর্যাদা কিন্তু আসলে তার যথার্থ মহত্বের কারণ নয়। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, আর সেই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিলেছিল তাঁর স্বভাবের ঔদার্য। দূর দেশে বাস করে চিঠিপত্রের মারফৎ তিনি তাঁর স্ত্রীর মন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন নতুন যুগের উপযোগী করে। সেই চিঠি-পত্রগুলি 'পুরাতনী'র একটি প্রধান অংশ, আর শেষাংশে পুলিনবিহারী সেনের—সত্যেন্দ্রনাথ-ঠাকুর, বাংলার স্ত্রী স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ নামে একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। তিনটি অংশ মিলে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় ও একটা ধারণা গড়ে তোলা যায়। ঠাকুরবাড়ীর পুরানো দিনের বহু কথা ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায় আমরা পেয়েছি। জ্ঞানদানন্দিনীর কথায় অন্দরমহলের তথ্য আরও কিছু জানা গেল। ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে কৌতূহল বাংলা দেশের মানুষের থাকা স্বাভাবিক, সেই কৌতূহল অনেক পরিমাণে জ্ঞানদানন্দিনী নিবৃত্ত করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু, তথ্যমূল্যই নয়, প্রাচীনাদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলা এই কাহিনী গল্পের রসা-স্বাদন এনে দেয় মনে। যে দিন বিগত, যা আর কোনদিন ফিরবেনা তার কথা বলা মানুষের চিরকালের আনন্দ। সেই গল্পের মধ্যে মহর্ষিদেবের এবং অন্যান্য অনেকের ক্ষণিক পরিচয় খুসীতে মন ভরে দেয়। সে একটা পরিবর্তনের যুগ নানা বিরোধী আদর্শের সংঘাত ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। ঠাকুর পরিবারের মধ্যেই স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে মত বিরোধ চলছে। এ গ্রন্থে ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব রচনা কিছু নেই—তিনি সংকলন করেছেন তাঁর মা'র কাহিনী এবং তাঁর পিতার পত্রাবলী। একজনের বলা আর একজনের লেখা স্মৃতিকথা ইতিপূর্বেই বাংলা সাহিত্যে একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' ইত্যাদির মধ্যে। সেইভাবেই তাঁর মায়ের কথা লিখে নিয়েছেন ইন্দিরাদেবী। জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর কথায় বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা তখনকার দিনের ভারতবর্ষের একটি ধারণা মনে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। অবশেষে তিনি বলছেন "আমারও এখন শরীর প্রাচীন ও অপটু। চোখে কানে ভাল দেখতে শুনতে পাইনে। সব কথা ভুলে যাই। সেইটেই আমার বেশী কষ্টকর মনে হয়। কাজেই পূর্বজীবনের কথা ধারাবাহিকভাবে বলা আমার পক্ষে

একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবু আমার মেয়ে ছাড়েন না, তাই তাঁর প্রশ্নের যতটুকু পারি উত্তর দিয়ে যাই। তাতে খাপছাড়াভাবে কিছু জানা যায় মাত্র।"

সত্যেন্দ্রনাথের পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের উদার প্রসারতা নেই, দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুরের চিঠিপত্রের মত সহজ রসিকতা নেই। তাঁর চিঠিপত্রে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে প্রাচীন সমাজ বন্ধন থেকে মুক্ত করে গড়ে তোলার যে একাগ্র চেষ্টা তা প্রথমেই চোখে পড়ে। এ সব চিঠি যে কোনদিন ছাপা হবে সত্যেন্দ্রনাথ তা নিশ্চয়ই মনে করেন নি। তাই তাঁর চিঠিগুলি ব্যক্তিহৃদয়ের উত্তাপে ভরপুর। একটি চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই তাঁর মন এবং তাঁর পত্রলেখার নিজস্ব ভঙ্গীটি ধরা পড়বে।—"আমি সেদিন এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছি, তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা ও হাসি হইতেছে—হঠাৎ আমাদের বাড়ীর ভিতরকার কাঠের ঝরকার দিকে নজর পড়িল। তাহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি কাহাকে আদেশ করিলাম—কৈলাস মুখুয্যেকে বুঝি—যে ওসব ঝরকা কেন ভাঙিয়া ফেল।" নারী স্বাধীনতার জন্য তাঁর ব্যগ্রতা প্রত্যেক চিঠিতেই প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থের শেষে পুলিনবিহারী সেন স্ত্রীস্বাধীনতার পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কারমূলক কার্যকলাপের কিছু পরিচয় দিয়ে গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। তবু শেষ পর্যন্ত এই ক্ষোভ পাঠকচিত্তে থাকা অসম্ভব নয় যে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী সম্বন্ধে যা জানা গেল তা নেহাৎই অল্প—পাঠকচিত্তের কৌতূহল নিবৃত্তি পক্ষে এ গ্রন্থ যথেষ্ট নয়।

সোমেন বসু

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ঃ— রথীন্দ্রনাথ রায়। ইণ্ট ইণ্ড কোম্পানী। দাম ৭ টাকা।

প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর বার বছর পরে তাঁর সম্বন্ধে একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হবার আগে অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহ রায় প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে একটি সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে গ্রন্থ বহুকারণে উল্লেখযোগ্য হলেও তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর সকল ধরণের সাহিত্যপ্রচেষ্টা এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর নির্ভীক নেতৃত্বের সম্যক পর্যালোচনা করা যে কারণেই হোক লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রমথ চৌধুরী এমন কি বড় লেখক যার জন্যে প্রায় চারশো পাতার একটি বই লেখার প্রয়োজন হতে পারে—এই ধরণের মনোভাব কোন মহলে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সেই খেদোক্তি মনে পড়ছে—বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন গল্প নাটক আর কবিতা নিয়ে। মননশীলতার স্পর্শ তার মধ্যে প্রায় নেই বল্লেই চলে। আমাদের রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ-নীতি সব কিছুতেই সস্তা ভাবলুতার প্রবল উচ্ছ্বাস বিংশশতাব্দী প্রথমাংশের লেখকদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্য আলোচনা থেকে রাজনৈতিক অভিভাষণ পর্যন্ত ভাবোচ্ছ্বেল গদগদ ভাষণের একটানা স্রোত। একদিকে নির্বিচার পাশ্চাত্যবিদ্বেষ আর অন্য দিকে দেশ প্রেমের নামে বিকৃত দুর্বল কল্পনার মোহমুগ্ধ পরিবেশ সকল রকমের বিচার শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। এ হেন অবস্থায় প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব। তাঁর ভাষা বিস্ময়কর, তাঁর তীক্ষ্ণ ভঙ্গী চমকপ্রদ কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় বিস্ময় তাঁর মন। তিনি জানতেন যে জনতার সহজ করতালি তাঁর কাম্য নয় তাই লোকস্বীকৃতির অপেক্ষা রাখেন নি। অন্যদিকে বাংলাসাহিত্যের ভাবারণ্যে তাঁর মত সহজ ঋজু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে জানবার চেষ্টা করতেই আমাদের চল্লিশ বছরের বেশী চলে গেল (সবুজপত্র প্রকাশের কাল ১৩২১)

প্রমথ চৌধুরীর সেই বিস্ময়কর মনটিকে জানবার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়। বহু তথ্য তিনি অশেষ ধৈর্য সহকারে সঞ্চয় করেছেন এবং সেই তথ্যগুলির সাহায্যে মানুষ ও স্রষ্টা প্রমথ চৌধুরীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। তাঁর পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ দেখলেই তাঁর আলোচনার ক্ষেত্র যে কত ব্যাপক তা বোঝা যাবে—ব্যক্তিজীবন, সবুজপত্র ও তার দেশ কাল, ঐতিহ্য উত্তরাধিকার ও বৈশিষ্ট্য, কবিতা ও কাব্যরূপ, চারইয়ারী কথা, প্রবন্ধাবলী রচনারীতি ও ষ্টাইল, ভাষাপ্রসঙ্গ, ভাবীকালের সঙ্কেত।

এই বিরাট আলোচনা দ্বারা যে শেষকথা বলা হচ্ছেনা, এ যে প্রমথ চৌধুরীর বলিষ্ঠ জীবন চেতনা অধ্যয়নের সূত্রমাত্র লেখক তা ভূমিকাতেই বলেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ নয়। আরও বহু তত্ত্ব বা তথ্যের সাহায্যে পূর্ণতর বিচার ভবিষ্যতে হতে পারে কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য কর্ম ও তাঁর মনকে জানবার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টায় লেখক যে সফল হয়েছেন একথা আমরা স্বিধাহীনচিত্তে বলতে পারি। তাঁর বিশ্লেষণ ও বিচারভঙ্গী কোথাও অকারণ জটিলতাসৃষ্টির দ্বারা পাঠককে বিড়ম্বিত করেনা। বরং অনাবশ্যক ভূমিকার ভার লাঘব করায় আলাচ্যবস্তুর আবেদন অতি সহজেই পাঠক চিত্তকে স্পর্শ করে।

সোমেন বসু